বঙ্গের পঞ্চরত্ন।

রাজা রামমোহন রায়, বাবু রামগোপাল ঘোষ,
বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জষ্টিস্
দ্বারিকানাথ মিত্র, মহাত্মা
কেশবচন্দ্র সেনের
জীবনী।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ পাল প্রণীত।

কলিকাতা
বেদান্ত প্রেস্—১২৭ নং মস্‌জীদ্ বাড়ী ষ্ট্রীট্।
শ্রীনীলাম্বর বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও প্রকাশিত।

সন ১২৯১ সাল।

বিজ্ঞাপন।

পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জীবনী লেখা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। অল্পের মধ্যে সকল কথা ন্যস্ত করিয়া পাঠকের মনে এই মহাত্মাগণের প্রতি আন্তরিক ভক্তির উদ্রেক করা, ও তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের প্রদর্শিত জ্বলন্ত পথের অনুগামী করিবার চেষ্টা করা এই পুস্তকের অভিপ্রায়। কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি পাঠক দিগের বিবেচ্য।

কলিকাতা
১লা অক্টোবর ১৮৮৪ } গ্রন্থকার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কি করিব? কি করিব? ভাবে কেশব উন্মত্ত প্রায় হইয়া জগতের ও মানব জাতির যথার্থ মঙ্গল সাধনের পথ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এই সময়ে মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে ও যত্নে রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত "আদি ব্রাহ্ম সমাজের" কার্য্য মহা সমারোহে চলিতেছিল, কেশব দূর হইতে এই সমাজের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন,—পরে আর নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না। মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথের নিকট পরিচিত হইলেন ও প্রকাশ্য ভাবে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এক্ষণে যে রূপ হিন্দুতে ও ব্রাহ্মে প্রভেদ লক্ষিত হয় না তখন সে রূপ ছিল না; তখন হিন্দুরা রীতিমত হিন্দুই ছিলেন, কলুটোলাস্থ সেন বাটী হিন্দুধর্ম্মের একটী সুদৃঢ় দুর্গ ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; সুতরাং কেশবের ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষা বার্ত্তা সেই বাটীতে প্রবেশ মাত্র তথায় কিরূপ গোলোযোগ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা বর্ণনার আর আবশ্যক নাই। চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল, অত্যাচারে বীর হৃদয়ের কি করিতে পারে? তিনি অত্যাচারে আরও দ্বিগুণীত উৎসাহিত হইতে লাগিলেন। অসংখ্য প্রতিবন্ধক ও অত্যাচার সত্ত্বেও ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রেলে তিনি মহর্ষীর সাহায্যে এক ব্রাহ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি

ইংরাজিতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা করিতেন ও মহর্ষী বাঙ্গালায় উপদেশ দিতেন।

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া কেশবের আত্মীয়গণ আর নিরস্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে স্থির করিয়া তাঁহাকে ২৫ টাকা মাহিয়ানায় "ফাইনানসিয়াল ডিপার্টমেণ্টে" এক কার্য্যে নিযুক্ত করাইলেন। কেশব স্বজনকে দুঃখিত করা কর্ত্তব্য নহে বিবেচনায় নীরবে আফিসে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু দুই সপ্তাহ না যাইতে যাইতে কার্য্যকালে তাঁহাকে সম্বাদপত্র পাঠ করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগের কার্য্যাধ্যক্ষ সাহেব তাঁহাকে অনত্র কার্য্যের চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিয়া বিদায় দিলেন। কেশব সাহ্লাদে সাহেবকে সেলাম করিয়া বিদায় হইয়া আসিলেন। তিনি ত সংসারের উত্তাল তরঙ্গময় সাগর বারি হইতে পলাইতে চাহেন কিন্তু তাঁহার আত্মীয়গণ তাহা বুঝেন কই? তিনি আবার ৩০ টাকা মাহিয়ানার এক কর্ম্মে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে প্রেরিত হইলেন। কেশব আবার নীরবে প্রত্যহ আফিস করিতে চলিলেন। ব্যাঙ্কের ডেপুটী সেক্রেটরি কুক সাহেব তাঁহার হস্তাক্ষরে অতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহাকে শীঘ্র ৫০ টাকার কার্য্যে উন্নীত করিলেন। কিন্তু কেশব কি নিজ কার্য্যে মাহিয়ানা বৃদ্ধি যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা করিতেছিলেন? তিনি কার্য্য করিতে করিতে "নব্যবঙ্গ, ইহা তোমারই জন্য" (Young Bengal, this is for you) নামে এক ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করিলেন। কুকসাহেব ইহা পাঠ করিয়া তাঁহার যুবক কেরাণী বাবুর প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু

হায়, যে বিদ্যাশিক্ষা করা সময় অপব্যয় মনে করিত সে কয় দিন কেরাণীগিরি করিতে পারে! অসুস্থতায় ভান করিয়া কেশব কার্য্যে অবসর লইয়া কৃষ্ণনগর পালাইলেন; আপনাকে মুক্ত পাইবামাত্র তিনি নিজ কার্য্যক্ষেত্রে আবার অবতীর্ণ হইলেন; কৃষ্ণনগরের যুবক দিগের এক সভায় তিনি তথাকার মিসনরি ডাইসন সাহেবকে মহা বিক্রমে আক্রমন করিলেন; ডাইসন ইহাতে নীরবে না থাকিতে পারিয়া ইহার প্রত্যুত্তর দিলেন। কেশব আবার তাহার প্রত্যুত্তর দিলেন, এইরূপ কয় দিবস ধরিয়া মহা যুদ্ধ চলিল —পরে কেশবেরই জয় হইল। মহা পণ্ডিত ডাইসন বালকের নিকট হারিলেন। নবদ্বীপ নিবাসী পণ্ডিতেরা তাঁহা দিগের চিরশত্রু পরাজিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন ও কেশবকে মহা সমারোহে এক অভিনন্দন পত্র প্রদান করিলেন। কৃষ্ণনগরের বক্তৃতা কৃষ্ণনগরেই রহিল না—চতুর্দ্দিকে তাঁহার প্রশংসা বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। সকলেই শুনিল যে কেশবের ন্যায় ইংরাজি বলিতে আর কেহ পারে না।

কৃষ্ণ নগর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কেশব কলিকাতা পুর্ব্বাস্থিত উল্টাডিঙ্গি নামক স্থানে তাঁহাদিগের উদ্যানে বাস করিতে লগিলেন; নিজ বাটীতে বাস করা তাঁহার পক্ষে একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে এক দিবস কলুটলাস্থ সেন বাটীতে ক্রন্দনের রোল উঠিল, কেশবের মাতা "কেশব, কেশব" বলিয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতেছিলেন। সেই দিবস কেশব

মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত লঙ্কা পরিদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলেন। কয়েক মাস লঙ্কায় অতিবাহিত করিয়া কেশব কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এক্ষণে তিনি সম্পূর্ণ রূপে ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য আত্মোৎসর্গ করিলেন। সর্ব্ব মঙ্গল কার্য্যে কেশব সর্ব্বাগ্রে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মেলেরিয়া নামক রাক্ষসী বঙ্গভূমির অঙ্গ উদরাসাৎ করিতেছিল, কেশব ঔষধ ক্রয় করিয়া গ্রামে গ্রামে প্রেরণ করিলেন, ৬০ সালে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভয়ানক মনন্তর উপস্থিত হইল, কেশব ব্রাহ্মসমাজে এই দুর্ঘটনা হইতে দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করিলেন। বিলাতস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত পত্রাদি লিখিতে লাগিলেন; এইরূপে আদি ব্রাহ্ম সমাজের তিনি এক প্রধান জীবনীশক্তি হইয়া পড়িলেন।

মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ কেশবকে নিজ পুত্রগণ অপেক্ষা ভাল বাসিতেন; তিনি নিজ সমাজে যে আসনে উপবেশন করেন, সেই উচ্চাসনে কেশবকে উপবেশন না করাইয়া থাকিতে পারিলেন না। কেশবকে আচার্য্য না দেখিলে শ্রবণে সন্তোষ হইল না। তিনি মহা সমারোহে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রেল কেশবকে আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য রূপে আলিঙ্গন করিলেন, ব্রাহ্মমণ্ডলী কেশবকে গুরু বলিয়া প্রণাম করিলেন। কেহ কি বিশ্বাস করিবেন যে, এই উৎসবের দিবস কেশবের বয়ঃক্রম কেবল মাত্র ২২ বৎসর, চারি মাস ও চারি দিবস হইয়াছিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহ যে পায় তাহার আবার বয়স কি?—

সে জন্ম দিবস হইতেই অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড করিতে পারে—কেশবের বয়স ত দ্বাবিংশ হইয়াছিল। এই বৎসর পীড়ায় তিনি অতিশয় কষ্ট পাইয়াছিলেন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কেশব "ইণ্ডিয়ান মিরর" নামে পত্রিকা প্রচার করেন। ইহা স্বদেশ হিতৈষী ব্যরিষ্টার বাবু মনমোহন ঘোষ মহাশয়ের সম্পাদকীয় হস্তে পাক্ষিক রূপে প্রকাশিত হয়। বিখ্যাত লেখক কাপ্তেন পামর ইহাতে রীতিমত লিখিতেন। যদিও এ পত্রিকা রাজনীতি সম্বন্ধীয়;—তত্রাচ ইহার ভাব ভঙ্গি সম্পূর্ণই ব্রাহ্ম ধর্ম্মীয় ছিল। কেশব লেখনী হস্তে অবতীর্ণ হইয়াছেন; খ্রীষ্টানদিগের ভ্রম সকল প্রমাণিত করিতেছেন, সুতরাং খ্রীষ্টানরা আর নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না। গোবিন্দ সামন্ত প্রণেতা রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তাঁহার "ইণ্ডিয়ান রিকর্ডার" নামক পত্রিকায় কেশবের প্রত্যুত্তর করিতে লাগিলেন; অবশেষে তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া "জেনেরেল এসম্‌ব্লিয়হলে" ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উপর এক বক্তৃতা দিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রেল "টাউন হলে" লোকে লোকারণ্য। তথায় প্রবেশ লাভার্থ লোকে জ্ঞান শূন্য হইয়াছিল; কলিকাতার অধিকাংশ লোক কেশবের বক্তৃতা শুনিতে ছুটিয়াছে। সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে সেই তাঁহার প্রথম—উচ্চ আসনোপরি দণ্ডায়মান হইয়া কেশবচন্দ্র সেন লালবিহারী দের প্রত্যুত্তর দিলেন; সেই বক্তৃতা যখন শেষ হইল তখন খ্রীষ্টান মিসনরীর মস্তক স্বরূপ ডাক্তার ডফ্‌ কেশবকে আলিঙ্গন না করিয়া থাকিতে

পারেন নাই। যেমন অগ্নি শিখা বায়ুবেগে তাড়িত হইয়া দেখিতে দেখিতে নগর আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে, সেই রূপ এই বক্তৃতা শেষ না হইতে হইতে কেশবের নাম সকলের জিহ্বায় ধ্বনিত হইতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে সমস্ত ভারতবর্ষে কেশব বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন,—তাঁহার যশ সাগর পারে বিস্তৃত হইল।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কেশব ধর্ম্ম প্রচারে বহির্গত হইলেন। প্রথমে মান্দ্রাজ নগরে গিয়া এক সমাজ স্থাপিত করিলেন, তথা হইতে বোম্বাই নগরে গিয়া তথাকার টাউন হলে সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে বক্তৃতা করিলেন। বোম্বাই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সার বারটেল ফেয়ার তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাটীতে সমাদর করিলেন। বোম্বাই হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি ভারতবর্ষের আরও অনেক স্থানে ধর্ম্ম প্রচারে গিয়াছিলেন। যেখানে গিয়াছেন, সেই খানেই যথেষ্ট সম্মান পাইয়াছেন। যে তাঁহার সুমিষ্ট স্বর শুনিয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে,—যেখানে তাঁহার বক্তৃতা হইয়াছে, সেই খানেই লোকে তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছে। পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম হইতে না হইতে তিনি ভারতবর্ষের উন্নতিশীল দলের মস্তক স্বরূপ বলিয়া দেশে বিদেশে স্বীকৃত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বড় দুঃখের বৎসর। যাঁহারা দুইজন প্রাণে প্রাণে সম্মিলিত তাঁহারা কালের কুটিল গতিতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। বিচ্ছিন্ন হইলেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদিগের উভয়ের ভাল বাসা কি কখন গেল? কেশব স্থির থাকিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করেন নাই; তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন তাহার শেষ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না; কেশব চাহেন, উন্নতি ও পরিবর্ত্তনের পথে অগ্রসর হইতে, মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথ যথা সাধ্য স্থির থাকিতে এবং যথায় আছেন তথায়ই থাকিতে চাহেন; সুতরাং উভয়ের একত্রে আর অধিক দিবস কার্য্যকরা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ ফেব্রুয়ারি কেশব তাঁহার পিতৃতুল্য গুরুদেব মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথের সমাজ পরিত্যাগ করিলেন। কয়েক দিবস পরে তিনি আত্ম সমর্থন করিয়া হিন্দু মেট্রপলিটন কলেজ বাটীতে এক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

ইহার পর প্রায় এক বৎসর পরে, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ১১ নভেম্বর, তিনি স্বয়ং "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজ" নাম দিয়া এক সমাজ স্থাপন করিলেন। বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বাবু উমানাথ গুপ্ত, বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু ইত্যাদি অনেকে প্রচার কার্য্যে আত্ম সমর্পন করিলেন। "ধর্ম্মতত্ত্ব" নামে এক পত্রিকা প্রকাশিত হইল। আদি ব্রাহ্মসমাজের সহিত

বিবাদ হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু মহর্ষীর সহিত তাঁহার বিবাদ হয় নাই। এক দিন মহর্ষী স্বয়ং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের বেদীতে উপবেশন করিয়াছিলেন।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে টাউন হলে তিনি "জিসাস্‌-ক্রাইষ্ট—ইয়ুরোপ ও এসিয়া" নামে এক বৃহৎ জ্ঞানগর্ভ, তেজস্বিনী বক্তৃতা দেন ; ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে ঐ স্থানে "বড়লোক" আখ্যায় আর এক বক্তৃতা দেন। তিনিই ব্রাহ্মোৎসবের প্রতিষ্ঠাতা, তিনিই খোল করতাল লইয়া সঙ্কীর্ত্তন বঙ্গের শিক্ষিতগণের মধ্যে প্রচলিত করেন। পরম ভক্ত চৈতন্য দেবের নির্ব্বাচিত ভাব তিনিই বঙ্গে পুনরুদ্দীপিত করেন। যে যাহাই বল, স্বীকার কর আর নাই কর, তুমি আমি সকলেই কেশবের পদানুসরণ করিতেছি ; কেশব যে অগ্নি জ্বালিয়া গিয়াছেন সমস্ত জগতের নর নারীর প্রাণ তাহায় ভস্মীভূত হইলেও তাহার সন্তোষ জন্মিবে না।

সেই সময়ে ভারতে সারজন লরেন্স ভারতেশ্বরীর নামে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। তিনি কেশবের বক্তৃতা পাঠ করিয়া এত মুগ্ধ হইলেন যে তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। প্রকাশ্য দরবারে কেশব যাইতে অনিচ্ছা করায় সারজন লরেন্স তাঁহাকে সাক্ষাতের নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই দিন উভয়ের মধ্যে যে বন্ধুত্ব জন্মিল তাহা আজীবন সমান ভাবে বিদ্যমান ছিল। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী হিন্দু মেট্রপলিটন কালেজ বাটীতে কেশব যে বক্তৃতা করেন তাহাতে সারজন ও লেডী লরেন্স উপস্থিত ছিলেন।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি প্রচারার্থে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিলেন এবং বাঁকিপুরে গভরনর জেনেরেলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁহাকে সিমলায় যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি গভরনর জেনেরেলের প্রাইভেট সেক্রেটরিকে লিখিলেন যে, তিনি সিমলায় যাইতে ইচ্ছা করেন। উত্তর অতি সম্মানজনক আসিল, তিনি সপরিবারে সিমলায় গিয়া কয়েক মাস যাপন করিলেন। তিনি যেরূপ অল্প বয়সে সর্ব্বত্র সমভাবে সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তেমন ভারত বর্ষে আর কখন কেহ পায় নাই; তাঁহার যেরূপ অল্প বয়সে দেশে বিদেশে নাম প্রচার হইয়াছিল, এরূপ আর কাহারও কখন হয় নাই। যাঁহারা কেশবকে কখন দেখেন নাই, কেবল তাঁহার নাম মাত্র শুনিয়া ছিলেন তাঁহাদিগকে কেশবের বয়স বলিলে তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না। সিমলায় কেশব নিশ্চিন্ত বসিয়া ছিলেন না, তিনি ব্রাহ্মদিগের বিবাহ সম্বন্ধে এক আইনের জন্য গভরনর জেনেরেলকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর আইন সম্বন্ধীয় মন্ত্রী সার হেনরি মেন "দেশীয় দিগের বিবাহ সম্বন্ধীয় আইনের" পাণ্ডুলিপি গভরনর জেনেরেলের সভায় উপস্থিত করিলেন। "আদি সমাজ" হইতে এই আইনের অনেক প্রতিবাদ হইল। কিন্তু কেশবের যত্নে ইহা চারিবৎসর পরে লর্ড মেওর শাসন কালে,

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চ্চ, আইন রূপে পরিণত হইল।

এই রূপে ত্রিস বৎসর বয়স হইতে না হইতে কেশব স্বদেশে নহে—কেবল ভারত বর্ষের সর্ব্ব প্রদেশে নহে—সমস্ত ইয়োরোপ খণ্ডে এবং দুরতর আমেরিকায়ও একজন "বড়লোক" বলিয়া গণ্য হইলেন। সকলেই স্বীকার করিল, কি শত্রু কি মিত্র সকলেই বলিল, যে কেশবের ন্যায় বক্তা ভারতবর্ষে কখন জন্ম গ্রহণ করেন নাই, পৃথিবীর মধ্যেও এরূপ অল্পই জন্মিয়াছেন, কেশবের ন্যায় চিন্তাশীল পণ্ডিত জগতে শত শত বৎসরের মধ্যে কাচৎ কোথায়ও একটী জন্মিয়া থাকেন, আর যে দেশে এরূপ মহাত্মা জন্মেন, সে দেশ তখনই পবিত্র হইয়া যায়। সকলেই বুঝিল যে মানবের মঙ্গলার্থে এরূপ ব্যক্তির জন্ম হয়।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রিকায় প্রকাশিত হইল যে কেশবচন্দ্র সেন বিলাত যাইতেছেন। এই সম্বাদ প্রকাশ হইবার কয়েক দিবস পরেই টাউন হলে এক সভা আহূত হইল, সেই সভায় কেশব তাঁহার বিলাত যাত্রার সম্বাদ প্রচার করিয়া "ইংলণ্ড ও ভারত" এই আখ্যায় এক সুদীর্ঘ ও মনোহর বক্তৃতা করিলেন। পাঁচশত টাকা সাধারণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইল। আরও আটশত টাকা তিনি সংস্থান করিতে সক্ষম হইলেন; এই সামান্য অর্থের সাহায্যে ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সাগরপারে ধর্ম্ম প্রচারার্থে যাত্রা করিলেন। ইংলণ্ডস্থ অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের দ্বারা তিনি নিমন্ত্রিত হইলেন।

ফেব্রুয়ারী মাসে মুলতান নামক জাহাজ তাঁহাকে লইয়া চলিল; কেশব মুলতানোপরি হিন্দু পরিচ্ছদে হিন্দুভাবে বিলাত পরিদর্শন করিতে চলিলেন। প্রায় এক মাস সাগরোপরে বাস করিয়া কেশব লণ্ডন নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক সামান্য বাসা ভাড়া লইয়া নানা লোকের সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে লণ্ডনে প্রচার হইল যে ভারতের বিখ্যাত বক্তা ও ধর্ম্মপ্রচারক কেশবচন্দ্র সেন ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়াছেন; কতলোক তাঁহাকে দেখিবার জন্যই ব্যগ্র হইল; কত সম্বাদ পত্রে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই,

এপ্রেল বঙ্গের এক শুভদিন সন্দেহ নাই ; ঐ দিবস ইংলণ্ডে যাঁহারা ধনে ও বিদ্যায় বড় তাঁহারা সকলেই কেশবকে সাদর সম্ভাষণ করিতে "হানোবার স্কোয়ার রুম্" নামক বাটীতে একত্রিত হইলেন। যাঁহারা সে দিন তথায় একত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কখন কেশবকে অগ্রে দেখেন নাই, কেহ কেশবের বক্তৃতা শ্রবণ করেন নাই ; কেবল সেই সকল বক্তৃতা পাঠ করিয়াছিলেন মাত্র। যখন সেই শ্বেত নর নারী সাগর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া কেশব বুক ফুলাইয়া তাঁহার সেই মধুর কণ্ঠে ভারতের দুঃখ ইংলণ্ডের কাণে বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিল ; বিদেশী যে কখনও এরূপ সুন্দর ইংরাজিতে এমন সতেজ বক্তৃতা করিতে পারেন ইহা কে সহজে প্রত্যয় করিতে চাহে ? যখন কেশব উপবেশন করিলেন তখন সকলেই এক বাক্যে কহিলেন যে ইংলণ্ডে একজন ব্যতীত এরূপ বক্তৃতা করিতে পারেন এমন লোক আর নাই। পর দিবস ইংলণ্ডের সমস্ত সম্বাদপত্র কেশবের যশ কীর্ত্তনে পূর্ণ হইল। পর দিবস কেশবের বক্তৃতা ইংলণ্ড বাসীগণ পাঠ করিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। "কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা," "ভারতের ধর্ম্ম প্রচারকের বক্তৃতা," বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক সম্বাদপত্র স্কন্ধে করিয়া "অক্সফোর্ডষ্ট্রীট," "রয়াল একশ্চেঞ্জ," "হাইড পার্ক" ইত্যাদি স্থান মাতাইয়া তুলিল। "জনবুল' যাহাকে তাহাকে কোন রূপ সুবিধা পাইলেই "লাওনাইজ" করিয়া থাকে, কেশবকে করিবে আশ্চর্য্য কি? কেশব

লণ্ডনে এবং ইংলণ্ড, স্কটলণ্ডের অধিকাংশ স্থানে বক্তৃতা করিলেন; প্রত্যহ শত শত স্থান হইতে তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল। কি ধর্ম্ম প্রচারক, কি রাজনীতিজ্ঞ সকলেই তাঁহাকে সমান সমাদর করিতে লাগিলেন।

তাঁহার নাম ইংলণ্ডের রাণী ভারতের ঈশ্বরী ও জগতের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান রাজ্যের অধিশ্বরী যিনি, তাঁহার কর্ণে উপস্থিত হইল। তিনি কেশবকে এক দিবস তাঁহার "উইনসর" নামক সুরম্য প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিলেন; নিজে তাঁহাকে পরিতোষ রূপে ফল মুলাদি আহার করাইলেন, পরিশেষে তাঁহার মৃত স্বামী কুমার আলবার্টের একখানি প্রতিমূর্ত্তী উপহার দিলেন। কেশবের সহিত পরিচিত হইয়া তিনি আপনাকে সম্মানিত মনে করিয়াছিলেন। কেশবের মৃত্যু বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তিনি কেশবের বিধবা ভার্য্যার নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছিলেন। যাঁহার করস্পর্শ করিতে পারিলে কত কত সম্রাজ্যাধিপতী আপনাদিগকে সম্মানিত মনে করেন, তিনি যে এক জন ভারত সন্তানকে এতদূর সম্মানিত করিলেন, ইহা কি আমাদিগের অল্প গৌরবের বিষয়।

এইরূপে প্রায় সাত মাস ইংলণ্ডে বাস করিয়া ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কেশব ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিলেন। পাঁচ সহস্র মুদ্রা সাধারণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া তাঁহাকে উপহার প্রদত্ত হইল। তিনি যে দিন অর্ণব পোতারোহণ করিলেন সে দিন কত লোক আসিয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

তিনি দেশে ফিরিলেন ;—ইংলণ্ডে কত কত দ্রব্য দেখিলেন ; সেই স্বাধীনতার ক্রীড়া ভূমি, বাণিজ্যের আলয়, উন্নতির উৎস দেখিয়া তাঁহার ভারতে আসিয়া কত কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইল। তিনি ইংলণ্ড দেখিয়া বুঝিয়া ছিলেন যে, ভারতের সকলই অভাব, ভারতের কিছুই নাই। বিলাত পর্য্যটন করিয়া ভারতে আসিয়া যাহা যাহা করিবেন স্থির করিয়াছিলেন তাহাতেই এক্ষণে নিযুক্ত হইলেন। আসিয়াই "ভারত আশ্রম" প্রতিষ্ঠিত করিলেন ; ব্রাহ্ম পরিবার সকল এক স্থানে থাকিলে অল্প অর্থ ব্যয়ে সুখে থাকিতে পারিবেন বিবেচনায় ইহার স্থাপনা হয় ; কিন্তু পরে ইহাতে সুধার পরিবর্ত্তে হলাহল উদ্গারণ করায় ইহা উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। "সুলভ" নামক সুলভ সংবাদ পত্র প্রকাশ করিলেন,—এক সময়ে ইহা বঙ্গের গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। "ইণ্ডিয়ান রিফর্ম্ম এসোসিয়েসন" নামক এক সভা স্থাপন করিলেন। জন কয়েক স্ত্রীলোককে শিক্ষয়িত্রী হইবার উপযুক্ত করিবার জন্য "ফিমেল নরমাল স্কুল নামক এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। একটী বালিকা বিদ্যালয়ও এই সঙ্গে হইয়াছিল। দেশ হইতে সুরা রাক্ষসীকে দূর করিবার নিমিত্ত যুবকদিগকে লইয়া "ব্যাণ্ড অফ হোপ" নামক এক সভা স্থাপন করিলেন। দূর দেশে যাইয়া যাহা সঞ্চয় করিয়া আসিয়া ছিলেন স্বদেশকে দুই হস্তে তাহাই বিতরণ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিলাত পরিদর্শন করিয়া কেশবের মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। তিনি দেখিলেন জগতে এক গুরুতর কার্য্য সম্পাদনার্থ পড়িয়া রহিয়াছে। যে সময় এক দেশের অধিবাসীগণ অন্যদেশবাসীগণের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অবগত ছিল না সেই সময়ে নানা দেশে নানা মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বদেশীয়গণকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে নানা ধর্ম্মের উৎপত্তি; একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই উপলব্ধি হইবে যে যেখানে যত ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, মূলে সকলই এক; এক্ষণে বিজ্ঞানের বলে মানব পৃথিবীকে এক করিয়া ফেলিয়াছে; পৃথিবীর এক প্রান্তের লোক অন্য প্রান্তের লোকের সহিত তারযোগে কথোপকথন করিতেছে; এই শত শত ভিন্ন দেশবাসী ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী এক্ষণে একত্র হইয়াছে; তাহারা এক সাথে এক পথে বিচরণ করিতেছে; ইহাদিগের প্রভেদ নষ্ট করিয়া ইহাদিগকে এক করাই এক্ষণে কার্য্য। সেই কার্য্য যে সাধন করিতে পারিবে সেই জগতের যথার্থ মঙ্গল সাধন করিবে। কেশব এই গুরুতর কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার দলস্থ অধিকাংশে তাঁহাকে বুঝিলেন না; তাঁহারা তাঁহার সহিত বিবাদ করিতে লাগিলেন। তৎপরে যখন তাঁহার কন্যার সহিত কুচবিহারের মহারাজের বিবাহ

হইল তখন তাঁহারা তাঁহাকে স্বার্থপর, নীচ ইত্যাদি কটূক্তি করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন। এইরূপে আর এক ব্রাহ্ম সমাজ হইল; তিনি ইহাঁদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া "নববিধানের" নিশান উড়াইলেন,—ব্রাহ্ম নাম পরিত্যাগ করিলেন। কেশব যে কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়া এই পতিতা বঙ্গভূমিকে পবিত্রা করিলেন সেই কার্য্য এতদিনে সম্পন্ন হইল। আজ কিম্বা কাল জ্ঞানের বিস্তারের সহিত জগতে তাঁহার প্রেমের ধর্ম্ম বিস্তৃত হইবে।

এই নূতন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া তিনি প্রতি বৎসর "টাউন হলে" ও "বিডেন গার্ডেনে" বক্তৃতা করিয়াছেন; ইহার ব্যাখ্যা করিয়া পুস্তক রচনা করিয়াছেন। পত্রিকায় লিখিয়াছেন। ইহার ব্যাখ্যা করিয়া নাটক রচনা করিয়া সেই নাটক অভিনয় করিয়াছেন। যদি অকালে কাল তাঁহাকে না লইয়া যাইতেন তাহা হইলে না জানি তিনি আরও কত কি করিতেন।

১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই তিনি পীড়ায় ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া আসিতে ছিলেন। সেই অমানুষিক পরিশ্রম মানব শরীর কত দিন সহ্য করিতে পারে? তিনি স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য সিমলায় গেলেন, পশ্চিমাঞ্চলে গেলেন; কিছুতেই পীড়ার উপশম হইল না। ক্রমে পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি শয্যাশায়ী হইলেন; কিন্তু শয্যায় শয়ন করিয়াও কি

তিনি নিরস্ত হইলেন; সেই পীড়িতাবস্থায়ই "নবসংহিতা" ও "যোগ" পুস্তক সম্পূর্ণ করিলেন। মৃত্যুর সাত দিবস অগ্রেও বক্তৃতা করিয়াছেন, উপাসনা করিয়াছেন, নূতন প্রার্থনা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন;—তাঁহার কার্য্যপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিতে গেলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তাঁহার পীড়া অতিশয় বৃদ্ধি হইল; কলিকাতার প্রধান প্রধান সমস্ত চিকিৎসক তাঁহার চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু তিনি থাকিবেন না তাঁহাকে রাখে কে? ৭ই জানুয়ারি হইতে তিনি অজ্ঞান হইলেন, পর দিবস, ৮ই জানুয়ারি প্রাতে ১২টা ১০ মিনিটের সময়, সেই অজ্ঞান অবস্থাতেই শত শত লোকের সম্মুখে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। তাঁহার প্রিয়-সহচরগণ "জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরি! জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরি!" শব্দে তাঁহাকে পুষ্পহারে সুসজ্জিত পালঙ্কে শায়িত করিয়া তাঁহারই স্থাপিত প্রার্থনা মন্দিরে তাঁহাকে শয়ান করাইলেন। সেই দিন সন্ধ্যাকালে প্রায় দশ সহস্র ব্যক্তির সম্মুকে কেশবচন্দ্র সেন ভস্মীভূত হইলেন। যাও, মা জাহ্নবী, যাও, কুল কুল শব্দে সাগরে যাইয়া সম্বাদ দেও,—আজ তোমার কূলে যাহা ভস্মীভূত হইল, তেমন আর কত কাল হইবে না। আজ যিনি তোমার কূলে কোথায় চলিয়া গেলেন তাঁহার মত শীঘ্র ভারতে বা জগতে কেহ জন্মিবে না।

সম্পূর্ণ।
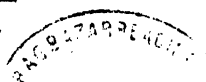
শুভাদৃষ্ট বশতঃ ও বঙ্গভূমির ভবিষ্য মঙ্গলের জন্য সেই সময়ে সাগরপারস্থ বৃটিশসিংহ বঙ্গে নিজ রাজ্য বিস্তার করিতেছিল, সেই সিংহ গর্জ্জনে মুরসিদাবাদে টল্‌টলায়মান মোগল সিংহাসনে নবাব ভয়ে সঙ্কুচিত হইতেছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব প্রতাপ আর নাই, রাজলক্ষ্মী মোগল সিংহাসন ত্যাগ করিয়া সাগর পারে যাইতেছিলেন।

এইরূপে যখন বঙ্গে মোগল পতাকা খসিয়া খসিয়া ধূলায় ধূসরিত হইতেছিল ও তৎস্থানে ত্রিরঙ্গে রঞ্জিত পতাকা স্থাপিত হইতেছিল সেই সময়ে বঙ্গসন্তানকে উন্নতির পথ দেখাইবার জন্য রাধানগরে কুলঠাকুরাণীর গর্ভে রামকান্ত রায়ের সুরম্য অট্টালিকায় রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেন। রামমোহন রামকান্তের কেবল মাত্র পুত্র নহেন; রামমোহনের জগন্মোহন নামে এক জেষ্ঠ্য ভ্রাতা ও রামলোচন নামে এক বৈমাত্র ভ্রাতা ছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উভয়ই নিঃসন্তান হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়েন।

শত বর্ষ পূর্ব্বে যে বঙ্গ ছিল, এক্ষণে সে বঙ্গের চিহ্নও নাই। রাজধানীর দূরতম প্রদেশে সামান্য পল্লীতে অনুসন্ধান করিলে তাহার কতক চিহ্ন লক্ষিত হইলেও হইতে পারে। যেরূপ পাঠশালায় পঞ্চবর্ষ বয়স্ক রামমোহন শিক্ষা লাভার্থ "পাততাড়ি বগলে, দোয়াত হাতে, কোঁছড়ে মুড়ীমুড়কী" হাসিতে হাসিতে যাইতেন, সে পাঠশালা, সে গুরু মহাশয়, সে চণ্ডিমণ্ডপ বঙ্গে প্রায় লুপ্ত হইয়া

আসিয়াছে; দশ বৎসরের মধ্যে তাহার কোন চিহ্নই আর থাকিবে না। পাঠশালায়,—শত বর্ষ পূর্ব্বে যেরূপ পাঠশালা এ দেশে গ্রামে গ্রামে স্থাপিত ছিল, সেই রূপ পাঠশালার যতদূর শিক্ষা লাভ করা সম্ভব রাম-মোহন অতি সত্বরই তাহা সমাপন করিলেন। তখন তাঁহার পিতা পার্শী ও আরবি শিক্ষার জন্য পাটনায় পাঠাইলেন। এক্ষণে যেরূপ ইংরাজী শিক্ষা না হইলে উচ্চপদস্থ হওয়া অসম্ভব, রামমোহনের শিক্ষা-কালে পার্শী ও আরবি ভাষা সেইরূপ ছিল। এক্ষণে যেরূপ কলিকাতা ইংরাজি শিক্ষার প্রধান স্থান, তখন সেইরূপ পাটনা নগরী আরবি ও পার্শী শিক্ষার প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। যে মেঘ পরে মহা আড়ম্বরে প্রলয় ঝটিকায় পরিণত হইবে, তাহাকে দেখি-য়াই চিনিতে পারা যায়। রামমোহনের শিক্ষার অনু-রাগ, আলস্যে বিরাগ ও সত্যে ঐকান্তিক মমতা তাঁহার শৈশবেই লোককে চমকিত করিয়াছিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আরবি ও পার্শী ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন; আরবি ভাষায় লিখিত বিখ্যাত দার্শ-নিক আরিষ্টটলের উপদেশপূর্ণ গ্রন্থাবলী ও বৈজ্ঞানিক প্রবর ইউক্লিডের জ্যামিতি তাঁহার বড় প্রিয় দ্রব্য ছিল।

কিন্তু যাবনিক ভাষা চর্চ্চা ও যাবনিক ধর্ম্ম পুস্তক পাঠে তাঁহার মনে ভয়ানক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল। পৌত্তলিকতা যে সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ, জগতের দয়াময় পিতা কাষ্ঠে লোষ্ট্রে বা মৃত্তিকায় যে তিনি নাই, ইহা তাঁহার

হৃদয়ে দৃঢ় প্রতীতি হইল। তাঁহার স্বদেশবাসী ও পৃথিবীর অধিকাংশ লোক যে পরম কারুণিক পরমেশকে ভুলিয়া মিথ্যা পুজায় নিযুক্ত আছে, ইহা দেখিয়া তাঁহার প্রাণে মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগিল। তিনি এক দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা মানবকে শিক্ষা দিবার জন্য হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। হিন্দু শাস্ত্রে যথার্থই কি পৌত্তলিকতা বিধিবদ্ধ আছে ইহা অবগত হইবার জন্য সংস্কৃত ভাষার প্রধান শিক্ষা স্থান পুণ্যভূমি কাশীধামে আগমন করিলেন, ও তথায় কায়মনবাক্যে সংস্কৃতালোচনায় নিযুক্ত হইলেন। সংস্কৃত শিক্ষায় তাঁহার পূর্ব্বভাব দৃঢ়ীভূত হইল। তিনি দেখিলেন হিন্দুশাস্ত্রে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে "একোমেবাদ্বিতীয়ং"।

পৌত্তলিকতা পূর্ণ দেশে ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিলেন। যখন গৃহে গৃহে দেব দেবী বিরাজ করিতেছিলেন,— যখন বঙ্গের নর নারী দেব দেবী পুজা ভিন্ন অন্য কার্য্য জানিত না, যখন সমাজের বন্ধন লৌহ শৃঙ্খল হইতেও সুদৃঢ় ও কঠিন ছিল তখন বালক রামমোহন নির্ভয়ে প্রচার করিলেন, "দেব দেবী পুজা মিথ্যা।" ওয়াটরলুর মহা যুদ্ধে ফরাসিধিপতি বীরসিংহ বোনাপার্টির যত না সাহস প্রয়োজন হইয়াছিল, কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবদিগের যত না সাহস আবশ্যক হইয়াছিল, পৌত্তলিকতাময় দেশে পৌত্তলিকার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে রামমোহনের তাহাপেক্ষাও অধিকতর সাহসের প্রয়োজন হইয়াছিল

সন্দেহ নাই। যখন বাঙ্গালাভাষা বিজে অবস্থান করিতে ছিল, যখন দুই এক জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ভিন্ন, লেখা দূরে থাকুক, শুদ্ধ করিয়া বাঙ্গালা কহিতে কেহই সক্ষম হইত না, সেই সময়ে, আজ হইতে চতুর্নবতি বর্ষ পূর্ব্বে, রামমোহন ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম কালে " হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্ম প্রণালী " নামে পুস্তক প্রণয়ন ও প্রচার করিলেন। মধুচক্রে সহসা আঘাত লাগিলে যেরূপ মধুমক্ষিকাগণ উন্মত্ত হইয়া ঘাতককে আক্রমণ করিয়া থাকে সেইরূপ উন্মত্ত হইয়া রামমোহনের স্বদেশীয়গণ তাঁহাকে চারিদিক হইতে আক্রমণ করিলেন। পুত্রের ঘোর পরিবর্ত্তনশীল মত যাহাতে তাহার হৃদয় হইতে দূরীভূত হয় পিতা পর্য্যন্ত তাহার জন্য নিজ বল প্রকাশ করিতে ত্রুটী করিলেন না। যে অগ্নি মানবজীবনাকাশে শূন্যরূপে প্রকাশ পাইবে তাহার তেজ নির্ব্বাপিত করে এমন সাধ্য কাহার? পিতা বিধর্ম্মী, ধর্ম্মনাশক পুত্রকে গৃহ হইতে বহির্গত হইতে আজ্ঞা করিলেন; বালক রামমোহন দ্বিরুক্তি না করিয়া পিতার পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিস্তৃত পৃথিবীতে একাকী বিচরণ করিতে চলিলেন।

অবতরণিকা।

পুণ্য-সলিলা, ভাগিরথী-প্রবাহিতা ফল-পুষ্পে সুশোভিতা বঙ্গভূমি, যে যাহাই তোমায় বলুক না কেন, যে যতই তোমার কুৎসা ও নিন্দা করুক না কেন, হে মাতঃ! তুমি যে রত্ন প্রসবিনী পুণ্য ভূমি এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। দিন দিন তোমার দারিদ্রতা বাড়িতেছে, তোমার সন্তানেরা উদারান্নের জন্য লালায়িত হইয়া দেশ বিদেশে ছুটিতেছে, দুঃশহ ব্যাধি যন্ত্রনা গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়া ক্রন্দনের রোল তোমার নীলাকাশ পূর্ণ করিতেছে, হে মাতঃ! এই ঘোর দুর্দ্দশাপন্ন অবস্থাতেও তুমি যে সকল রত্ন প্রসব করিয়াছ, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, পৃথিবীর সৌভাগ্যশালী ও উন্নতোন্মুখী কোন প্রদেশেই তেমন একটীও জন্মে নাই। শত বর্ষের মধ্যে দীনা হীনা বঙ্গে যে পঞ্চরত্ন জন্মিয়াছে যে রত্নের উজ্জ্বল প্রভায় সমস্ত পৃথিবী

কেন্দ্র হইতে কেন্দ্র পর্য্যন্ত এখনও পর্য্যন্ত আলো-কিত ও চমকিত হইয়া রহিয়াছে, পৃথিবীস্থ সৌভাগ্যশালী সকল দেশের সেই শত বর্ষের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, কই তাহার তুল্য তো একটীও পাইলাম না। মা! আশীর্ব্বাদ কর, দরিদ্র সন্তান তোমার সেই পঞ্চ রত্নের জীবনী জগতে প্রকাশ করিয়া স্বদেশী বিদেশী সকলকেই দেখাইয়া দিউক বঙ্গ রত্নভূমি;—প্রকৃ-তির লীলাভূমি বঙ্গভূমি দীনা হীনা হইলেও রত্ন প্রসবিনী দেবী।

হে স্বদেশ বাসী! কাল চক্রের কুটিল গতিতে নানা রূপে পদ দলিত হইতেছ, অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যাইতেছে, অন্যান্য জনপদবাসীগণের সৌভাগ্য দেখিয়া সেইরূপ সৌভাগ্য লাভাশায় প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছ, কিছুতেই হে ভাই! নিরাশ হইওনা। যখন এই ঘোর তিমিরাবৃতা কাল রজনীতে পাঁচটী উজ্জ্বল নক্ষত্র আমাদের সম্মুখে জ্বলিয়া আমাদিগকে গৌরবের পথ দেখা-ইয়া দিতেছে—যখন বঙ্গের এমন দুর্দ্দিনেও এমন রত্ন জন্মিয়াছে তখন আর আমাদিগের ভয় কি,

তখন আর আমাদিগের গতিরোধ করে এমন সাধ্য কাহার? উজ্জ্বল মনোহর রত্ন ঐ তোমাদিগের সম্মুখে; ইহাঁদিগের উপদেশময়ী জীবনী সর্ব্বদা পাঠ কর ও স্মরণ রাখ, তাহা হইলে এই উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল দুঃখ সাগরে আশার আলোকে হৃদয় উত্তেজিত হইবে;—উহাঁরা জগতের দেবতা, উহাঁদের দৃষ্টান্তে আমরা অন্ততঃ মানব নামের উপযুক্ত হইতেও সক্ষম হইব।

হে বিদেশী ভাই! ঘৃণা কর, পশু বলিয়া আমাদিগকে বিবেচনা কর, কীটের ন্যায় আমাদিগকে অহরহঃ পদদলিত কর,—আমরা এরূপ ব্যবহারেরই উপযুক্ত—কিন্তু অনুরোধ করি একবার—যে রত্ন কয়টী বঙ্গে জন্মিয়াছে, যাহার একটী, দূর বিদেশে বিদেশী মধ্যে পুণ্য শয়নে শায়িত রহিয়াছে—একবার সময় সময় তাঁহাদিগের কথা স্মরণ করিও। অভাগিনী বঙ্গভূমিকে ঘৃণা করিবার পূর্ব্বে, একবার তাঁহাদের নাম হৃদয়ে আনিও,—তাহা হইলে হয়তো বঙ্গমাতার আলুলায়িত কেশ পূর্ণ মস্তকে পদোত্তলন করিতে সঙ্কুচিত হইবে। তাহা হইলে হয়তো

বঙ্গভূমিকে শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম করিয়া দূরে দণ্ডায়মান হইবে। যাহার ধমনী মধ্যে মানব শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, যাহার হৃদয়ে দেবাদিদেব জগৎপাতা পরমেশ্বরের অতুলনীয় গুণরাশীর এক বিন্দুও বিরাজমান আছে সে, যে দেশে রাজা রামমোহন রায় ও কেশব চন্দ্র সেন জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সে দেশকে পুণ্যভুমি মনে করিয়া প্রণাম করিয়া দূরে ভক্তিভরে দণ্ডায়মান রহিবে।

চিন হইতে চিলি পর্য্যন্ত এই নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত সমাকুল পৃথিবী মধ্যে শিক্ষিত বলিয়া এমন কেহ কি বিদ্যমান আছেন যাঁহাকে বলিয়া দিতে হইবে বঙ্গের এই পঞ্চরত্ন কে কে? জগতের গৌরব রাজা রামমোহন রায়ের নাম প্রচার নাই এমন জনপদ কোথায়। দীনের বন্ধু অসম-সাহসিক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম অবগত নাই বঙ্গে এমন কে? অকালে কালগ্রাসে পতিত, না হইলে হরিশের ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ পৃথিবী মধ্যে অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যাইত। বক্তা রামগোপাল ঘোষ অন্য দেশে জন্মিলে এত দিন ডিমসথিনিস

ও সিসিরোর ন্যায় সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। ভারতবর্ষের উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণের উচ্চতম আসন হইতে যাঁহার তেজ সাগর পারে প্রবাহিত হইত সেই দ্বারিকানাথ মিত্রের নাম অবগত নহে, ভারতে বা ইংলণ্ডে এমন কে আছে? কেশব, তোমাকে না চিনে জগতে কে? সময়ে দেশে দেশে সমস্ত পৃথিবীতে তুমি দেবতা বলিয়া পূজিত হইবে।

বঙ্গের পঞ্চরত্ন।

রাজা রামমোহন রায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যখন এই বঙ্গে অজ্ঞতার, গাঢ় অন্ধকার প্রবল পরাক্রমে রাজ্য বিস্তার করিতেছিল, যখন পাপের স্রোত খর প্রবাহে বঙ্গের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে প্রবাহিত হইতেছিল, যখন সহস্রবর্ষ ব্যাপী মুসলমান রাজ্যের কুফল অহরহঃ ফলিতেছিল, সেই সময়ে বিধাতার অপার করুণায় পতিতা বঙ্গকে উত্থিতা করিবার জন্য রাজা রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ বর্দ্ধমান নগরীর কয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী রাধানগর গ্রামে রামকান্ত রায় নামে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন। রাজা রামমোহন রায় ইহাঁরই সন্তান। ১১৮১ সাল ও ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ জগতে চিরকাল পুণ্যময় বলিয়া ঘোষিত হইবে; কারণ ঐ বৎসর রাজা রাম-

মোহন রায় বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিতে স্বর্গত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

রামকান্ত রায়ের পূর্ব্বপুরুষগণ রাধানগর বাসী নহেন। মুরসিদাবাদের অন্তবর্ত্তী শাঁকসা গ্রামে ইহাঁদের আদি নিবাস। রামকান্ত রায়ের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মুরসিদাবাদ হইতে রাধানগরে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন। যখন রামকান্তের পূর্ব্বপুরুষেরা "রায়" উপাধি পাইয়াছিলেন ও যখন নিজ সন্তান সন্ততিদিগের জন্য যৎকিঞ্চিৎ সংস্থান করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন তখনই সকলের বুঝিয়া লওয়া কর্ত্তব্য যে তাঁহারা নবাব বাহাদুরের সরকারে কার্য্য করিতেন। যশ ও মান উপার্জ্জনের ইহা ভিন্ন তৎকালে অন্য উপায় ছিল না। তখন নবাবের কটাক্ষে পথের ভিখারী এক দিবসে রাজাধিরাজ বাহাদুর হইয়া শত শত গ্রামাধিপতি হইয়াছে। আবার নবাব কোপে এক দিবসে রাজাধিরাজ ভিখারি হইয়া গিয়াছে। রামকান্ত রায়ের তদ্রূপ অনিষ্ট ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হওয়ায় ও অনতিবিলম্বে মুরসিদাবাদ পরিত্যাগ করায় পিতৃধন রক্ষা করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছিলেন। যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি সেই সময়ে রাধানগরে নবাবের দরবারের বহুদূরে অবস্থান করিয়া তিনি একরূপ সুখে সচ্ছন্দে ও সসম্মানে কালাতিপাত করিতেছিলেন। নবাবের কোপ হইতে তিনি কখনই আত্ম রক্ষার্থ দূরে পলায়নে সক্ষম হইতেন না; তাঁহার

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গৃহ ত্যাগ করিয়া রামমোহনের প্রাণের আশা পূর্ণ হইবার সুযোগ হইল। নানা দেশে যাইয়া নানা ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা তাঁহার হৃদয়ে বহুদিবস হইতে ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতেছিল। এক্ষণে তিনি সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য চলিলেন। চারি বৎসর দেশে দেশে ফিরিলেন; অবশেষে বৌদ্ধধর্ম্ম জ্ঞাতার্থ দূর তিব্বতে সন্ন্যাসীবেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি যেথানে যান, যে গৃহে বসতি করেন, যে ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করেন, সেই সেই স্থানে, সেই সেই গৃহে, সেই সেই ব্যক্তিই কাষ্ঠ, লোষ্ট্র, ও মৃত্তিকা পূজায় নিযুক্ত। পথে, ঘাটে, মাঠে, দেশে বিদেশে সর্ব্বত্রই তিনি নির্ভয় হৃদয়ে কহিয়াছিলেন "একোমেবাদ্বিতীয়ং"।

দূর তিব্বতে বিদেশী, বিভাষী অসভ্যদিগের মধ্যে তাঁহার সত্য প্রচার বিপদ সঙ্কুল হইয়া উঠিল। যাহাদের হৃদয়ে স্বর্গীয়তা কি অরণ্যে, কি নগরে একই ভাবে বিরাজ করে, যাহাদের হৃদয় দয়া, মায়া, কোমলতা দিয়া অনেক যত্নে বিধাতা সৃজন করিয়াছেন তাহারা রক্ষা না করিলে অকালে বিদেশে রামমোহনের জীবন অসভ্য হস্তে নষ্ট হইত। তিব্বতবাসিনীগণ অনেক যত্নে তাঁহার জীবন ক্রোধান্ধ স্বদেশবাসীগণের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন; এই জন্য রামমোহন আজীবন নারীজাতিকে তাঁহার প্রেমময় ব্রহ্মের নিম্নেই সম্মাননা করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে চারি বৎসর দেশে দেশে ফিরিয়া রামমোহন গৃহে ফিরিলেন। চারি বৎসরের অদর্শনের পর কোন্ জনক জননী আছেন যাঁহারা ধর্ম্মের অনুরোধে পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন না করিয়া থাকিতে পারেন ?

যিনি একবার সুধাময় জ্ঞান ফলের মধুর আস্বাদ পাইয়াছে তিনি আর কি নিরস্ত থাকিতে পারেন ? গৃহে আসিয়া রামমোহনের দৃষ্টি সাগরপারস্থ ইংরাজদিগের ভাষা ও ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইল। দ্বাবিংশ বর্ষ বয়সে তিনি এই ভাষার বর্ণমালা শিক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি এই ভাষা কি রূপ আয়ত্ত্য করিয়াছিলেন, যে দেশের কঠিন মৃত্তিকার নিম্নে তিনি শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, যাও, সেই দেশের প্রধান ব্যক্তিদিগকে তাহা জিজ্ঞাসা কর। এই বয়সে রামমোহন সংস্কৃত, বাঙ্গালা, আর্‌বী, পারশী, উর্দ্দু, হিন্দি, ও ইংরাজি এত দূর আয়ত্ত্য করিয়াছিলেন যে তিনি অনেক পণ্ডিত হইতে ভাল সংস্কৃত, অনেক মৌলবী হইতে ভাল আর্‌বী, ও অনেক ইংরাজ হইতে ভাল ইংরাজিতে কথা কহিতে ও লিখিতে পারিতেন। ইহার পর তিনি হিব্রু, লাটিন, গ্রিক ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। রামমোহন যত ভাষায় পণ্ডিত হইয়া ছিলেন, এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে তেমন আর কেহই হয়েন নাই। যে রূপ সময়ে, যে রূপ দেশে ও যে রূপ অবস্থাতে তিনি এই দুরূহ ভাষা সকল শিক্ষা করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে তাঁহাকে কোন অমানুষিক উন্নত জীব না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না।

১২১০ সালে, ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে, রামকান্ত রায় মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। যিনি এত কাল সংসারে উদাসীন হইয়া মন প্রাণে সরস্বতীর আরাধনা করিতেছিলেন তাঁহার এক্ষণে সংসারের ক্লেশকর ভার মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইল। পিতা যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলনার্থে তাহা তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট নহে। রামমোহন চাকরীর চেষ্টায় বহির্গত হইলেন। এই সময়ে ব্রীটেন সন্তানগণ এক রূপ সমস্ত বঙ্গদেশ নিজ কর কবলিত করিয়াছিলেন—নবাব বাহাদুর নাম মাত্র বঙ্গাধিপতি রূপে মুরসিদাবাদের ভগ্ন সিংহাসনে বিরাজ করিতেন। জেলায় জেলায় ইংরাজেরা কর আদায়ের জন্য কলেক্টরী স্থাপন করিয়া এক এক জন কলেক্টর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রামমোহন চাকরীর চেষ্টা করিতে করিতে রঙ্গপুর জেলাস্থ কলেক্টরীতে একটী যৎ সামান্য কার্য্য সংস্থান করিতে সক্ষম হইয়া অনতিবিলম্বে তাহাতে নিযুক্ত হইলেন। সৌভাগ্য ক্রমে—যিনি সরস্বতীর বরপুত্র, যিনি ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিতে প্রেরিত তাঁহার সৌভাগ্য কোথায় নহে?—সৌভাগ্য ক্রমে কলেক্টর ডিগবী সাহেবের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য হইল। তাঁহারই অনুগ্রহে ও যত্নে এবং নিজ অমানুষিক পরিশ্রমে রামমোহন ইংরাজি ভাষা অত-দূর আয়ত্ত্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজি শুনিয়া ও পাঠ করিয়া সমস্ত ইয়ুরোপবাসী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। এক্ষণের ন্যায় তৎকালে বিশ্ববিদ্যালয় নগরে নগরে স্থাপিত হয় নাই, এক্ষণের ন্যায় তৎকালে বিখ্যাত

ইংরাজ পণ্ডিতগণ ঐ সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করিতে আসিতেন না, এক্ষণের ন্যায় তৎকালে বঙ্গের সন্তান ইংলণ্ডে যাইয়া ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতেন না, তত্রাচ ডিগ্‌বির সাহায্যে ও নিজের যত্নে রামমোহন যেরূপ ইংরাজি শিক্ষা করিয়া ইংরাজি লিখিয়া গিয়াছেন সেরূপ ইংরাজি লিখিতে পারেন, অনুসন্ধান করিলে, এরূপ লোক ভারতবর্ষে এখনও অতি অল্পই মিলে।

শত বর্ষ মধ্যে বঙ্গভূমে কত প্রকারে কত পরিবর্ত্তন সংঘটন হইয়াছে ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। আজ আমরা কলেক্টরের পদ পাইয়াও সন্তুষ্ট নহি, আজ আমরা বঙ্গের শাসনকর্ত্তার পদ কেন না পাইব বলিয়া ইংরাজদিগকে উৎপীড়িত করিতেছি, আজ আমরা কেহ সহস্র, কেহ দ্বিসহস্র, কেহ পঞ্চ সহস্র মুদ্রা পারিশ্রমিক পাইয়াও সন্তুষ্ট নহি, কিন্তু অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে, সেরেস্তাদারি পদ পাইয়া ও অর্দ্ধ শত মুদ্রা পারিশ্রমিক লাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতাম। সেরেস্তাদারি লাভ করিলে মনে করিতাম রাজকার্য্যের সর্ব্বোচ্চ শিখর লাভ করিয়াছি। রামমোহন কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই অতি উচ্চ ও সম্মানজনক সেরেস্তাদারি কার্য্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এক্ষণে যেরূপ যাঁহারা চাকরী করেন তাহারা প্রায়ই কিছুই সংস্থান করিতে পারেন না, তখন সেরূপ ছিল না; তখন চাকরীতে "বেস দু দশ টাকা" হইত। সুতরাং চাকরীর উচ্চতম শিখরে উপবেশন করিয়া রামমোহন যে যথেষ্ঠ সংস্থান করিতে পারিয়া

ছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। এই সময়ে তাঁহার ভ্রাতা দ্বয় কালগ্রাসে পতিত হইলেন, তাঁহাদের সন্তানাদি না থাকায় তাঁহার পৈত্রিক বিষয় সমস্তই তাঁহার প্রাপ্য হইল; কিন্তু তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার জাতি গিয়াছে বলিয়া বিশেষ গোলযোগ করিয়া তুলিলেন। অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া, অনেক দিবস পর্য্যন্ত বিচারালয়ে সময় নষ্ট করিয়া অবশেষে তিনি তাঁহার প্রাপ্য ধন প্রাপ্ত হইলেন; তখন আর তাঁহার ক্লেশকর চাকরীর পাপ জীবন বহন করিবার প্রয়োজন হইল না; তিনি চাকরীর নিকট বিদায় লইয়া মুরসিদাবাদে আসিলেন। যিনি বাল্যকাল হইতে সংসারে বিরাগী, যে ধন মান কি তাহা বুঝিতেন না, যে মানব জাতির দুঃখ ক্লেশ ভাবিয়া তাহা দূরীকরণ করিবার জন্যই সর্ব্বদা যে ব্যস্ত রহিতেন, যিনি জ্ঞানোপার্জ্জনে উন্মত্ত হইয়া বেড়াইতেন, তিনি এত অর্থলোভী হইলেন কেন? রামমোহন দেখিয়াছিলেন, ও বিশেষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে অর্থ বিনা তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিতে তিনি কখনই পারিবেন না, অর্থ বিনা তাঁহার হৃদয়ের বাঞ্ছা হৃদয়েই লুপ্ত হইবে; তাহাই তিনি অর্থ উপার্জ্জনে নিযুক্ত হইয়া ছিলেন। যখন যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সংস্থান হইল অমনি তিনি তাঁহার পূর্ব্ব কার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, অমনি তিনি কার্য্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া মুরসিদাবাদে আসিয়া পারসী ভাষায় "পৌত্তলিকতা সকল ধর্ম্মের বিরুদ্ধ" নামে এক পুস্তক প্রচার করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে মুরসিদাবাদ হইতে সৌভাগ্য লক্ষ্মী ধীরে ধীরে ভাগিরথী তীরে গোবিন্দপুরে আসিয়া বসতি করিতে ছিলেন। দূর দেশবাসী অসম সাহসিক বণিকগণ হুগলী হইতে দূরীভূত হইয়া অরন্যানী পূর্ণ বন্য জন্তু সঙ্কুল ক্ষুদ্র গোবিন্দপুর ও সুতানুটী নামক পল্লিদ্বয়ে নিজ বাণিজ্যার্থে অবস্থান করিতেছিল; বিধাতার বিধানে মোগল রাজলক্ষ্মী মহারাষ্ট্র ও রাজপুত গৃহে যাইয়াও না যাইয়া দূর দেশবাসী ইংরাজ গৃহে আসিলেন। ইংরাজ পতাকা বঙ্গের নগরে নগরে উড্ডীয়মান হইল, ক্ষুদ্র সুতানুটী ও ক্ষুদ্রতর গোবিন্দপুর অমরাবতী সদৃশ হইয়া উঠিতে লাগিল; নিকটস্থ নৃমুণ্ড-মালিনী কালির "কোটা" হইতে এই নূতন নগরীর নাম-করণ হইল। কালিকোটা বা কলিকাতার ন্যায় নগরী এক্ষণে ভারতবর্ষের আর কোথায়?

রামমোহন নিজ নূতন ধর্ম্ম প্রচারের উপযুক্ত স্থান বুঝিয়া নূতন নগরীতে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে (১২২১ সালে) আসিয়া বসতি করিলেন। নগরের পূর্ব্ব প্রান্তে "সারকুলার রোডের" উপরে পুষ্প উদ্যানে পরিবেষ্টিত সুরম্য অট্টালিকায় নির্জ্জনে রামমোহন রায় বাস করিতেন। চল্লিশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে রামমোহন নিজ হৃদয়ের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য সম্পূর্ণ রূপে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। পৌত্তলিকতাময় কলিকাতা নগরে "একোমেবাদ্বিতীয়ং" শব্দ বিঘোষিত

হইল। যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আজ প্রায় বঙ্গের শিক্ষিত মাত্রেই গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ রোপিত হইল। মাসে মাসে রামমোহন ইংরাজিতে, পার্শীতে ও বাঙ্গালাতে নানা পুস্তক প্রচার করিতে লাগিলেন। যে অর্থ কঠিন পরিশ্রমে উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এক্ষণে সেই অর্থ পৃথিবীর উপকারের জন্য ও মানবের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করিতে লাগিলেন। পরোপকারের জন্য তাঁহার জন্ম, পরোপকারই তিনি করিয়া গিয়াছেন; যে পর্য্যন্ত এ পৃথিবী অনন্ত নীলসমুদ্রে ভাসমান থাকিবে, ততকাল তাঁহার নাম দেশে দেশে নর নারীর জিহ্বায় ধ্বনিত হইবে।

কে কবে সৎকার্য্য করিতে সহজে পারিয়াছে? এক জন একটী নূতন কার্য্যে, একটী মহৎ কার্য্যে ব্রতি হইলে শত জন তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলোপ করিবার চেষ্টা পাইয়া থাকে। রামমোহনের তাহাই ঘটিল; চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার উপর গালীবর্ষণ হইতে লাগিল; কত শত সহস্র বজ্র অত্যুচ্চ হীমাদ্রি মণ্ডিত হিমালয়ে পতিত হইয়াছে, কই তাহার একটীও কি এ পর্য্যন্ত গিরিরাজের এক ক্ষুদ্র অংশও স্থানচ্যুত করিতে পারিয়াছে? স্বদেশী, বিদেশী, স্বধর্ম্মী, বিধর্ম্মী, সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থান করিলেন,—রামমোহন শান্তভাবে, ধীরে ধীরে তাঁহাদিগের সকলকেই বুঝাইতে লাগিলেন। এই গুরুতর কার্য্যে তিনি কত মনোরথ হইয়াছিলেন কিনা তাহার বিচার অনন্তকাল অনেক দিন করিয়া দিয়াছেন।

প্রথমে তাঁহার কথায় কেহই কর্ণপাত করিল না, ক্রমে দুই চারি জন শুনিল, তাঁহার মতাবলম্বী হইল, ক্রমে তাঁহারই জয় ঘোষিত হইল। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে (১২৩৪ সালে) "ব্রাহ্ম সমাজ" স্থাপিত হইল। এই ব্রাহ্ম সমাজ এখনও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের করুণ আশ্রয়ে বিদ্যমান রহিয়া দিন দিন মানব জাতির কল্যাণ সাধন করিতেছে। "ব্রাহ্ম সমাজ' হইল, তাহার পরম শত্রুরূপে "ধর্ম্ম সভাও" আবির্ভূত হইলেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া দুই দলে মহা সংগ্রাম চলিল; গলিত পতিত হিন্দুধর্ম্ম পূর্ণ সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের গুঢ়তত্ত্বের প্রাণ নাশ করিতে কত দিন ধরিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিল, অবশেষে পরাস্ত হইয়া আপনার লজ্জায় আপনি লজ্জিত হইয়া নাম পরিবর্ত্তন করিয়াও প্রাণ রক্ষায় সমর্থ হইল না।*

এক্ষণে রামমোহনের নাম দেশে দেশে প্রচার হইয়াছে। দূর ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে তিনি সুপণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। কি ধর্ম্মোন্নতি, কি সমাজ সংস্কার, কি রাজনৈতিক আন্দোলন সকল বিষয়েই রামমোহন রায় সর্ব্বাগ্রে। দেশের মধ্যে যাঁহারা ধনে কুবের সদৃশ, অথচ যাঁহারা লক্ষ্মীর অভিসম্পাতের ভাগী নহেন, তাঁহারা সকলেই রামমোহনের সহচর, সুহৃদ ও সঙ্গী। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কাশী

* ধর্ম্ম সভা পরে ধর্ম্মরক্ষিণী সভা নাম ধারণ করে।

নাথ মল্লিক, বৃন্দাবন মিত্র, রাজা কালিশঙ্কর ঘোষাল, রাজা বদনচন্দ্র রায় ইত্যাদি অনেকেই রামমোহনের উপদেশে তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বী হইলেন। কি সুন্দর ও মনরঞ্জক দৃশ্য তখন না জানি হইত যখন রামমোহন রায় ও তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণ সারকিউলর রোডস্থ বাটী হইতে মাণিকতলা ষ্ট্রীট দিয়া পদচারণে সন্ধ্যার সময় যোড়াসাঁকস্থ ব্রাহ্ম সমাজে যাইতেন। সকলেরই ইজার চাপকান ও পাগড়ী পরিধান—এরূপ বেশ ব্যবহার একটী নিয়মের মধ্যে অবধারিত ছিল—সকলই ধীরে ধীরে চলিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে তাঁহাদিগের শত্রুগণ কুটিল দৃষ্টিতে তাঁহাদিগকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে—ধর্ম্মদ্বেষী পাষণ্ডদিগকে পাইলে খণ্ড বিখণ্ড করিলেও তাহাদিগের মর্ম্মান্তিক ক্রোধ শমিত হইত কি না সন্দেহ। রামমোহন সত্যের জন্য কত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন। অন্য কথা আর কি,—পথে বিচরণ করিতে হইলে শত্রুভয়ে তাঁহাকে স্বশস্ত্র থাকিতে হইত। কিছুতেই তাঁহার দৃকপাত নাই, যাহাতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা সুসম্পন্ন না করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই; যে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তথায় তাঁহার জয় পতাকা সুদৃঢ় প্রোথিত না করিয়া, তিনি তাহা পরিত্যাগ করিয়া আসেন নাই।

তাঁহার দয়া দরিদ্রের পর্ণকুটীরে প্রবাহিত হইত, তাঁহার উদারতা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিত। তাহাই বলিয়া রামমোহন ধর্ম্মভীতু যোগী পুরুষ ছিলেন বলিতে পারি না,

অথবা তিনি অনেকের ন্যায় কপটতা জানিতেন না। তিনি সুরাপান করিতেন,—কাহারও নিকট তাহা কখনই গোপন করিতে চেষ্টা পান নাই, বরং কোন কোন স্থলে পরিমিত পানের সাপেক্ষ্যে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন; তিনি মাংসাদি, এমন কি হিন্দুর পক্ষে যাহাপেক্ষা গুরুতর পাপ কার্য্য আর নাই, সেই গোমাংস, পর্য্যন্ত আহার করিতেন। রামমোহনের বাটী ইংরাজের ন্যায় বিলাতি প্রথায়, বিলাতি সজ্জায় সুসজ্জিত,—রামমোহনের আহার বিহার প্রায় ইংরাজি, রামমোহনের বেশ মুসলমান দিগের ন্যায়, তবে কি হায় ভারতীয় কিছুই তাহাতে ছিল না! তবে কি হায় তিনি সর্ব্ব প্রকারেই জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন! যদি এইরূপ প্রশ্ন কাহারও হৃদয়ে উদিত হয় তাঁহাকে বলি যাও রামমোহনের সমাজ একবার দেখিয়া আইস। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, পুণ্য সলিলা জাহ্নবী কূলে, কালিন্দী-বরণী খর প্রবাহিণী যমুনা পুলিনে ও এক্ষণে অন্তর্হৃতা স্বরস্বতী তটে যে গান, যে ধ্যান, ও যে পরব্রহ্মের উপসনা হইত, রামমোহনের সমাজে তাহাই হইতেছে। যে গীতা আশ্রমে আশ্রমে গীত হইত, রামমোহনের সমাজে তাহাই গীত হইতেছে। সনাতন আর্য্য ধর্ম্মে কালে কালে মালিন্য একত্রিভূত হইয়া গিয়াছিল,—ভারতবাসী স্বর্ণ ত্যাগ করিয়া লৌহ ব্যবহার করিতেছিল, সুধা ভ্রমে হলাহল পান করিতেছিল; হায়রে,—ভারতের অধঃপতন যতদূর হইবার হইয়াছিল; রামমোহন গলিত পলিত হিন্দুশাস্ত্রকে প্রেম চক্ষে দেখিয়া ও প্রেমে আলিঙ্গন করিয়া মৃত্যুমুখ হইতে

উদ্ধার করিয়া প্রচার না করিলে হয় তো এত দিনে হিন্দু শাস্ত্র অগাদ কাল সমুদ্রে নিমগ্ন হইত। তাঁহার মত হিন্দু কে? তিনি যদি হিন্দু না হইয়া ওই ভাক্ত, ভণ্ড, তুলসি-হার-কণ্ঠ, দুগ্ধ-ফেননিভ যজ্ঞসূত্র গলে, সংস্কৃতানভিজ্ঞ গণ্ডমূর্খ, কপট ব্রাহ্মণ হিন্দু হন তবে যথার্থই মহাত্মা আর্য্য ঋষিগণের পবিত্র নামে কলঙ্ক রেখা পতিত হইয়াছে; তবে যথার্থই হিন্দু ধর্ম্ম বলিয়া কোন ধর্ম্মই আর নাই,—ঐ নামে পাপাচার সংঘটন করিবার সুবিধা জনক এক প্রথা মাত্র এই পতিতা ভারতে প্রচলিত আছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামমোহনের তেজ কলিকাতা নগরী স্তম্ভিত করিয়া দিক্ দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাঁহার ধর্ম্মকথা, তাঁহার পাণ্ডিত্য দেশে দেশে প্রচারিত হইল। এই সময়ে (১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ) লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক ভারত রাজ্যে শাসনকর্ত্তা রূপে নিয়োজিত ছিলেন; অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে তিনি রামমোহনের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার পরামর্শ প্রাপ্ত হইলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন।

সহসা কলিকাতা নগরী আন্দোলিত হইয়া উঠিল—হিন্দুগণ ভীত হইয়া একেবারে ধর্ম্ম নষ্ট হইল বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন; অনাথিনী হিন্দু বিধবা দিগকে প্রজ্জলিত চিতানলের ভীষণ ও ভয়াবহ মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য রামমোহন রায় গভর্ণর জেনেরেলের নিকট আবেদন করিয়াছে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের দোষ ও নিষ্ঠুরতা, সপ্রমাণ করিয়া পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। এই লোমহর্ষণ হৃদয়বিদারক কাণ্ড ভারতবর্ষ হইতে দূর করিবার জন্য বাল্যকাল হইতে তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল। তাঁহার স্বীয় ভ্রাতৃজায়ার—জগন্মোহনের সহধর্ম্মীর—সহমরণ কালে তিনি সেই প্রজ্জলিত চিতার পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া এই হৃদয় বিদারক নিষ্ঠুর কার্য্যের আদ্যপান্ত দেখিয়াছিলেন এবং সেই দিন সেই শ্মশানে

সেই চিতা-ভষ্মের পার্শ্বে তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে ভারতের এ কলঙ্ক অপনোদনের চেষ্টা প্রাণপণে করিব। সেই কার্য্যে এক্ষণে তিনি নিযুক্ত হইলেন। হায়, এরূপ মহৎ কার্য্যেও তাঁহার বিরুদ্ধে লোকে দণ্ডায়মান হইল। তাহা না হইলে আর ভারতের এ দুর্দশা হইবে কেন? কয়জন বিধবা স্বইচ্ছায় প্রজ্জলিত চিতায় প্রাণ দান করিত? কয়জন, হে পুরুষ! তোমাদের মধ্যে কয়জন প্রিয়তমা ভার্য্যার চিতায় প্রাণদান করিতে প্রস্তুত আছ, বলিতে পার? সেই প্রজ্জলিত চিতা, সেই বালিকার শুষ্ক মুখ, সেই বাদ্যভাণ্ড মহারোল, সেই চিতার উপর প্রাণ রক্ষার্থে বালিকার বৃথা প্রয়াস, সেই তাহার উপর বংশের প্রহার—সেই, সেই লোমহর্ষণ ব্যাপার—ভাবিলে প্রাণের ভিতর যে কেমন করিয়া উঠে! বুঝি এইরূপ পবিত্রাত্মা সহস্র সহস্র নারীর হত্যা পাপেরই জন্যই আজ ভারতবর্ষের এ দুর্গতি! এই পৈশাচিক ব্যাপার ভারত হইতে দূর করিতে যে দণ্ডায়মান হইল, তাহার প্রতিও আক্রোষ, তাহার প্রতিও শত্রুতা, এই মহৎ কার্য্যেরও প্রতিবন্ধকতা! কিন্তু সকল বাধা বিপত্তি কাটাইয়া রামমোহনেরই জয় হইলেন। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর ভারতের বিধবা বালিকাদিগের মহোৎসবের দিন,—ঐ দিবস লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিক সতিদাহ প্রথা বিদূরিত করিলেন। ভারতের গাঢ়তর কলঙ্ক রেখা অপনোদিত হইল। যত দিন চন্দ্র সূর্য্য গগনে রহিবেন, যত দিন হিমানিমণ্ডিত হিমালয় বিরাজ করিবেন, ততদিন এই মহৎ কার্য্যের জন্য রামমোহনের নাম নগরে, অরণ্যে

দেশে, বিদেশে—সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইবে। রামমোহনের যত্ন, প্রয়াস ও সাহস না হইলে, হয়তো আরও কতদিন এই রূপে কত অনাথিনীর ভস্মিভূত চিতাগ্নি হইতে ধূম উত্থিত হইয়া, ভারতাকাশে কালিমা সঞ্চিত করিত! আর সেই শাপে ভারত আরও কতদিন হয়তো দুঃখ সাগরের, গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া দিবারাত্রি কাঁদিত!

ভারতবর্ষে নিজ পতাকা প্রথিত করিয়া রামমোহন ভাবিতেছিলেন, একবার সেই দেশে যাইবেন, যে দেশের রাজার রাজ্যে কখন সূর্য্য অস্তমিত হয়েন না। একবার সেই দেশ দেখিবেন, যে দেশ সভ্যতায়, বিদ্যায়, জ্ঞানে, বীর্য্যে সর্ব্ব প্রকারে সকল দেশ হইতে শ্রেষ্ঠ। যখন যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন, করুণাময় ঈশ্বর তখনই তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন, এক্ষণেও তাহা করিলেন। যে অতুল ধন সঞ্চয় করিয়া, তিনি কলিকাতায় প্রবেশ করিয়াছিলেন পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া উঠিল; স্বদেশের মঙ্গলের জন্য তিনি মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করিয়া অনতিবিলম্বেই নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন; নতুবা তাঁহার ইংলণ্ডযাত্রার পক্ষে এত ক্লেশ হইবে কেন? কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা কখন অসম্পূর্ণ রহে নাই। এই সময়ে ভগ্ন সিংহাসনস্থিত বৃদ্ধ জরাজীর্ণ সিংহতুল্য দিল্লীশ্বর নিজ দুর্দ্দশা-কাহিনী ইংলণ্ডেশ্বরকে জানাইয়া ইষ্ট-ইণ্ডিয়া, কোম্পানীর নিকট হইতে কয়েক স্থান পুনপ্রাপ্তির প্রার্থনা করিবার ইচ্ছা করিতেছিলেন; এবং ঐ কার্য্য সম্পাদনার্থ এক ব্যক্তিকে ইংলণ্ড প্রেরণ করিবার মানস করিয়া, উপযুক্ত কার্য্যক্ষম

ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতেছিলেন। রামমোহন রায়ের ন্যায় তখন আর কে ভারতবর্ষে জীবিত ছিল? তিনি রামমোহনকে রাজা উপাধি দিয়া, ইংলণ্ডে প্রেরণ স্থির করিলেন।

যখন প্রচার হইল, যে রাজা রামমোহন রায় ম্লেচ্ছ দেশে চলিয়াছেন, ব্রাহ্মণের সন্তান ম্লেচ্ছ অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া সম্পূর্ণ ম্লেচ্ছভাবে সাগরপারে চলিয়াছেন, তখন একেবারে হিন্দুসমাজে ঘোর বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল। তখন তাঁহাকে এই ঘোর অন্যায় কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য অনুনয়, বিনয়, অনুরোধ, ভয় ইত্যাদি নানা রূপ উপায় অবলম্বন করা হইতে লাগিল। রামমোহন কবে লোকের কথায় কর্ণপাত করিয়াছেন? যখন কলিকাতায় আসিতে পল্লিগ্রামস্থ লোকের অনেকে "উইল" করিত, যখন দূর দেশে যাওয়া ও মৃত্যু একই বলিয়া অনেকের ধারণা ছিল, সেই সময়ে রামমোহন রায় নির্ভয়ে ও সাহ্লাদে অনন্ত সমুদ্র পার হইয়া, কত কত ক্রোশ দূরস্থিত ইংলণ্ড দেশে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে বিদেশ ও মৃত্যু যথার্থই এক হইল;—তিনি গেলেন, কিন্তু আর ফিরিলেন না। কে কবে এমন রত্ন পাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে? আমাদের অমূল্য রত্ন ব্রিটেনিয়া হৃদয়ে পাইয়া হৃদয়ের মধ্যে লুকাইল, আর প্র

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর সোমবার অতি প্রত্যূষে "আলবিয়ন" নামক সুন্দর অর্ণবপোত কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে সাগরাভিমুখে চলিল। রাজা রামমোহন রায়কে বিদায় দিয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ ক্ষুণ্ণ মনে, বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; সেই দিন হইতে কলিকাতা নগরীকে যেন কোথা হইতে মেঘ আসিয়া আচ্ছন্ন করিল। অনন্ত নীল সমুদ্রের তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া "আলবিয়ন" চলিল, আর সেই "আলবিয়নমধ্যে" যদি কেহ যাইত, তবে সে দেখিতে পাইত, রাজা রামমোহন রায় বসিয়া হিব্রু বা সংস্কৃত পাঠ করিতেছেন। যখন ঝটিকা উত্থিত হইয়া তরঙ্গে তরঙ্গে অর্ণবপোতকে নাচাইত, যখন জাহাজস্থ অন্যান্য সকলে শশঙ্কিত হইতেন, সেই সময় রামমোহন আনন্দমনে পরব্রহ্মের নাম গান করিতেন।

এইরূপে চারি মাস তেইশ দিবস নীল সমুদ্রে ভাসিয়া ভাসিয়া, ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রেল "আলবিয়ন" ইংলণ্ডস্থ লিবরপুল নামক বিখ্যাত নগরে উপস্থিত হইল। তাঁহার আগমনবার্ত্তা পাইবামাত্র উইলিয়ম র‍্যাথবোন আপন "গ্রিন ব্যাঙ্ক" নামক সুন্দর বাটীতে তাঁহাকে বাস করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি স্বাধীন ভাবে থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করিয়া, রাড্‌লিস্‌

হোটেল নামক লিভারপুলস্থ বিখ্যাত হোটেলে নিজ বাসস্থান অবধারিত করিলেন। কত লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল,—কতলোক তাঁহার উপযুক্ত সম্মান করিবার জন্য ব্যগ্র হইল, কত লোক তাঁহাকে দেখিয়াই আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করিতে লাগিল। অল্প দিবস মাত্র তিনি লিভারপুলে অবস্থান করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী লণ্ডনে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে—যে নগরীর বস্ত্রে ভারতের নরনারীর লজ্জা নিবারণ হইতেছে, সেই সৌভাগ্য শালিনী ম্যান্‌চেষ্টর পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। যখন তিনি লণ্ডনে উপস্থিত হইলেন, তখন রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকা অতীত। নগরস্থ এক অতি জঘন্য-হোটেলে যাইয়া তিনি উপস্থিত হইলেন, তথায় জঘন্যতর গৃহ ও শয্যা তাঁহাকে প্রদত্ত হইল। অধিকক্ষণ সেই স্থানে বাস করা দুঃসাধ্য বুঝিয়া, তিনি সেই রাত্রিতেই শকটারোহণে "এডেল্‌ফি" হোটেলে উপস্থিত হইলেন। পর দিবস "এডেল্‌ফির" দ্বারে প্রতি মুহূর্ত্তে নানা প্রকার শকট, নানা প্রকার সাজে সজ্জিত, হইয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। লণ্ডনস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিমাত্রই এতদিন যাঁহার নামমাত্র শুনিয়াছিলেন, এতদিন যাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া বিস্মিত হইতেছিলেন, সেই রাজা রামমোহন রায়কে দেখিতে আসিলেন। কয়েক দিবসের মধ্যেই রামমোহনের নাম অনন্তসমুদ্রবিশেষ লণ্ডন নগরীর গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইল।

প্রথম কয়েক মাস রামমোহন হোটেলে বাস করিয়া-

ছিলেন, পরে ভারতবন্ধু ডেভিড হেয়ারের অনুরোধে তাঁহার ভ্রাতাদিগের সহিত তাঁহাদিগের বাটীতে বাস করিতে বাধ্য হইলেন। যে কার্য্যের জন্য তিনি স্বদেশ, আত্মীয় স্বজন, ও পুত্রকন্যাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সুদূর সাগরপারে গিয়াছিলেন তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে তিনি কখনই ত্রুটী করেন নাই। সাগরপারে বিদেশীয়দিগের হৃদয়েও তিনি "একোমেবাদ্বিতীয়ং" শব্দ গভীর ভাবে অঙ্কিত করিতেও ক্ষান্ত হয়েন নাই।

১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে তিনি ফ্রান্স পরিদর্শনে গমন করিলেন। ফ্রান্সাধিপতি সম্রাট লুই ফিলিপ তাঁহাকে যথোপযুক্ত সম্মান করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত এক সঙ্গে একাসনে উপবেশন করিয়া তিনি ভোজন পর্য্যন্তও করিয়াছিলেন! এই রূপে সসম্মানে ও সাদরে রাজা রামমোহন রায় ফ্রান্সে এক বৎসর যাপন করিয়া লণ্ডনে প্রত্যাগমন করিলেন। ডেভিড্ হেয়ারের ভগ্নী কুমারী হেয়ার ব্রিষ্টল নগরের প্রান্তস্থিত "ষ্টেপল্টন্ গ্রোভ" নামক সুন্দর উদ্যানবাটীতে রাজা রামমোহন রায়কে লইয়া গেলেন। নগরের কোলাহল হইতে দূরে অবস্থান করিয়া, ইংলণ্ডস্থ পল্লিগ্রামে বাস কি মনোহর তাহাই দেখাইবার জন্য তাঁহাকে তথায় লইয়া গেলেন। কিন্তু হায়! কুক্ষণে তিনি ষ্টেপল্টন গ্রোভে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তথা হইতে তাঁহাকে আর কোথায়ও যাইতে হইল না।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবারে রাজা রামমোহন রায় জ্বরাক্রান্ত হইলেন। দিবারাত্রি সম-

ভাবে কুমারী হেয়ার তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন, তাঁহার আত্মীয় স্বজন, মাতা এবং ভগ্নী ও বোধ হয় কখন এতদূর করিতে পারিতেন না। ব্রিষ্টলস্থ প্রধান প্রধান চিকিৎসকেরা তাঁহার প্রাণরক্ষার্থে প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু হায়!—যাঁহাকে 'তিনি' চাহেন, তাঁহাকে রাখে এমন এ পৃথিবীতে কে আছে? ২৭শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার—রাত্রি দুইঘটিকা ২৫ মিনিট—আকাশে চন্দ্র হাসিতে ছেন, সেই আলোকে ষ্টেপল্‌টন্ গ্রোভস্থ সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ লতা হাসিতেছে; সেই সময়ে যে ঘটনা ঘটিল তাহাতে সমস্ত ভারত প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল,—সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায় মানবলীলা সম্বরণ করিয়া, স্বর্গে দেবলীলায় প্রস্থান করিলেন। ব্রিটেনিয়া বিদেশীর জন্য ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—এই দুর্ঘটনায় ভারত যে উন্মত্ত হইবে আশ্চর্য্য কি? পর দিবস বিদেশীগণ আত্মীয় হইয়া তাঁহার পবিত্র দেহ স্কন্ধে করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া কবরস্থ করিলেন। এইরূপে দূর বিদেশে বিদেশীদিগের মধ্যে রাজা রামমোহন পুণ্যশয়নে শায়িত হইলেন; এইরূপে ভারতের চন্দ্র ও জগতের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র কালসাগরে বিলীন হইয়া গেল।

বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত গমন করিয়া তাঁহার শব আরনোস্‌ ভেল নামক সুন্দর স্থানে প্রোথিত করিয়া তদুপরি এক মনোহর সমাধিমন্দির স্থাপিত করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে যে যাও সেই দূর দেশে এক

বার আর্‌নোস্‌ ভেলে যাইও, একবার রাজা রামমোহন রায়ের কবরের উপর অশ্রুপাত করিয়া আসিও—একবার তথায় জানু পাতিয়া বসিয়া বলিও—"মহাত্মন্‌, যাঁহারা আপনাকে চিনিতে না পারিয়া আপনার উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরই সন্তান আজ সেই দোষের ক্ষমা প্রার্থনার জন্য আপনার নিকট উপস্থিত, আপনাকে ভক্তিভরে পূজা করিবার জন্য এখানে উপবিষ্ট।" আর যাহাদিগের ভাগ্যে সেই পুণ্যভূমি, সেই তীর্থভূমি দর্শন ঘটিবে না, তাহারা আইস, একবার তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করি। তিনি যে পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তিনি যে ভারত উত্তোলিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার গতি রোধ করে এমন সাধ্য কাহার? যে শব্দ ভারতাকাশে বিলোপ পাইয়া গিয়াছিল, যে ঋষি-বাক্য ভারত হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল,—তাহা রাজা রামমোহন রায় পুনর্ধ্বনিত করিয়া গিয়াছেন। ঐ তিনি যাইতেছেন,—তাঁহার হস্তে ভারতের গৌরবের নিশান উড়িতেছে, আইস হে ভারতবাসী, আমরা জয়, জয়, শব্দে তাঁহার অনুসরণ করি।

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যাঁহার নাম আমাদের প্রবন্ধের শিরোভূষণ করিতে প্রাণ স্বতঃই হর্ষে আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে, তিনি যে এক জন মহা পণ্ডিত, বা মহা লেখক ছিলেন এরূপ নহে—বিদ্বান, পণ্ডিত, বক্তা ও লেখক তিনি ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাপেক্ষা, অনুসন্ধান করিলে, পণ্ডিত ও লেখক আমরা আমাদিগের মধ্যে অনেক দেখিতে পাইলেও পাইতে পারি। বিদ্যার জন্য, জ্ঞানের জন্য, লেখনীচালনের জন্য তাঁহাকে বঙ্গদেশের একটী রত্ন বলিয়া আমরা বিবেচনা করি না;—তিনি দরিদ্রের বন্ধু, অসহায়ের সহায়, বিপন্নের রক্ষক ও দুঃখিনী বঙ্গের সুসন্তান ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে আমরা পূজা করি। তিনি কাঙ্গালিনী বঙ্গের কাঙ্গাল সন্তানদিগের উন্নতির জন্য, তাহাদিগের অধিকার রক্ষার জন্য, তাহাদিগের সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে দেবতা মনে করি। তাঁহার মত স্বদেশহিতৈষী ও বিপন্নের বন্ধু এই বিস্তৃত পৃথিবীতে কয় জন ছিলে?

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে (১২৩১ সালে) কলিকাতার দক্ষিণস্থ ভবানীপুরে অতি দরিদ্র গৃহে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। সকলেই বলিয়া থাকে দরিদ্রতার ন্যায়

পাপ আর নাই, দরিদ্রের ন্যায় ঘৃণার পাত্রও আর নাই, তাহাই বুঝি বিধাতা সর্ব্বত্র দরিদ্র গৃহেই রত্ন সম্ভূত করিয়া, জগতকে দরিদ্র যে ঘৃণার দ্রব্য নহে-তাহা দেখাইয়া দিতেছেন। হরিশ্চন্দ্রের পিতা এক মহা "কুলিন" ছিলেন। সুতরাং যৎকালে মহা কুলিন মহোদয়গণ কেহ অশীতি, কেহ নবতী উদ্বাহ ক্রীয়া সমাপন করিয়াও বিন্দুমাত্র ক্লান্ত বা পরিশ্রান্ত বোধ করিতেন না, তৎকালে হরিশ্চন্দ্রের পিতা মহাশয়ের কেবলমাত্র সাতটী বিবাহ শুনিয়া কাহারও আশ্চার্য্যান্বিত হইবার কারণ নাই। এরূপ দলে দলে বিবাহ করিয়া কুলিন মহাশয় যে তাঁহার ভার্য্যাসগুলীকে নিজগৃহে স্থান দানে সম্পুর্ণ অক্ষম হইয়া পড়িতেন, ইহাতে তাঁহার অপরাধ বিন্দুমাত্র হইত না। হরিশ্চন্দ্রের মাতার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল, তিনি কখনও শ্বশুরালয় দেখেন নাই, স্বামীকে সময় সময় দেখিতে পাইতেন মাত্র। এই সকল কারণে ভবানীপুরে মাতুলালয়ে হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলেন।

সাত বৎসর বয়ক্রম কালে হরিশ লেখা পড়া করিতে বিদ্যালয়ে চলিলেন। তাঁহার কূট প্রশ্নের ভয়ে বিদ্যালয়স্থ কয়েক জন শিক্ষক সর্ব্বদাই শশঙ্কিত রহিতেন। তাঁহার শিক্ষায় যত্ন, ও পাঠে মনোযোগ, তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অত্যাশ্চর্য্য মেধা, দেখিয়া শিক্ষকেরা বুঝিয়াছিলেন, হরিশ সামান্য বৃক্ষের অঙ্কুর মাত্র নহে, হরিশ-অঙ্কুর বাঁচিয়া থাকিলে বৃহৎ বটবৃক্ষে পরিনত হইবে, কত শত পথিক তাহার তলে ক্লান্তি দূর করিয়া কৃতার্থ হইবে, কত ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র পক্ষী তাহার শাখায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন রক্ষা করিবে। পরে তাহাই কি ঘটে নাই?

চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে হরিশের শিক্ষকেরা তাঁহাকে হিন্দু কালেজের বালকদিগের সহিত পরীক্ষা দিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, তাঁহারা হরিশের অমতাতিত কার্য্য করিতে হরিশকে প্রেরণ করিলেন—হরিশ পরীক্ষায় হারিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় ও ত্যাগ করিলেন। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া তিনি অন্নের জন্য কত কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কথায় শ্রবণ কর। হে বিধাতঃ, তুমি পরীক্ষা না করিয়া কাহাকেও যে তোমার কার্য্যে নিযুক্ত করনা, তাহা জানি। তিনি কোন বন্ধুর নিকট এক দিবস এই রূপ গল্প করিয়া ছিলেন;—"এক দিন ঘরে কিছু খাবার সংস্থান নাই, এমন পিতলের বাসনও ছিল না যে বন্ধক দিয়া সে দিনের খরচ চালাই; বিষণ্ণ ভাবে আপন দুঃখ চিন্তা করিতেছি। ঈশ্বর যে আমাকে ত্যাগ করিবেন, ইহা আমার বিশ্বাস হইতেছে না, প্রাণপনে তাঁহাকে ডাকিতেছি, এমন সময়ে কোন জমিদারের একজন মোক্তার আসিয়া, কতক-গুলি বাঙ্গালা কাগজ ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া দিতে কহিলেন, ও আমায় পারিশ্রমিক স্বরূপ দুই টাকা দিতে চাহিলেন। আমি তখনই সেই কাজ আরম্ভ করিলাম ও দুটী টাকা পাইয়া সে দিনকার মত সংসার চালাইলাম।" হায়, কে জানে, কতদিন হরিশের এইরূপ ঘটিয়াছে!

চাকরির চেষ্টা করিতে করিতে 'টলা' নামক একজন নিলাম কারক সাহেবের নিকট হরিশ আট টাকা মাহিনায়

এক সরকারি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সেই আট টাকা মাহিনার কার্য্যে হরিশের উৎসাহ ও পরিশ্রম, হায়, কেহ তখন দেখিত না, যদি দেখিত তাহা হইলে বুঝিত, যে ঐ যে দীর্ঘপদ নিক্ষেপ করিতে করিতে দ্রুত বেগে ভবানীপুর হইতে এক জন যুবা চলিয়াছে, ও সামান্য লোক নহে— কয়েক বৎসর পরে উঁহারই দ্বারে বঙ্গের উৎপিড়ীত প্রজাগণ আসিয়া প্রাণ রক্ষা হইল মনে করিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে হরিশের অদৃষ্টাকাশে ধীরে ধীরে সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ হইল। ঐ বৎসর তিনি পরীক্ষায় প্রথম হইয়া ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গমধ্যস্থ সেনা বিভাগীয় অফিসে ২৫ টাকা মাহিয়ানার এক কার্য্য লাভ করিলেন। কার্য্য সামান্যই, কিন্তু কার্য্যের সহিত তিনি যে দুইজন বন্ধু লাভ করিলেন, তাঁহারাই তাঁহার উন্নতির পথ সরল ও তাঁহার হৃদয়ের মহৎ উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করিবার দ্বার প্রশস্ত করিয়া দিলেন। সেনাপতি চেম্পানিজ্ ও কর্ণেল গলডি তাঁহার উপর অতিশয় অনুরক্ত হইলেন, তাঁহার নিজ আফিসস্থ অধ্যক্ষ ফেলনার ও মেকেঞ্জি সাহেব তাঁহাকে বন্ধু ভাবে গ্রহণ করিলেন, ও পুস্তকাদি দিয়া তাঁহার শিক্ষার যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলেন। যে তেজস্বিনী লেখনী পরে দরিদ্রের দুঃখকাহিনীকে, সদ্যুক্তি ও অখণ্ডনীয় তর্কে

পরিপূরিত করিয়া "হিন্দু পেট্রিয়টে" গর্জ্জিত, তাহার পুষ্টির নিমিত্ত হরিশ এই সময় হইতে সোৎসাহে ও মহা পরিশ্রমে পাঠ আরম্ভ করিলেন। কার্য্যস্থান হইতে বিশ্রাম পাইলেই হরিশ্চন্দ্র "মেটকাফহলে" (কলিকাতার সাধারণ পুস্তকালয়ে) বসিয়া পাঠ করিতেন। সেই সময়ে যে মেটকাফহলে গিয়াছে সেই লক্ষ করিয়াছে যে একজন যুবা এক মনে পুস্তক পাঠ করিতেছেন—চতুর্দ্দিকে কত কি হইয়া যাইতেছে তাঁহার তাহার প্রতি বিন্দু মাত্র ও লক্ষ নাই।

সেনাপতি চেম্প্যানিজের অনুগ্রহে হরিশ এক বৎসরের মধ্যে এক শত টাকা মাহিনার কার্য্যে উন্নীত হইলেন। ক্রমে তিনি "আসিষ্টাণ্ট মিলিটরি অডিটরের" সহা-নিক পদও লাভ করিয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে তাঁহার চারি শত মুদ্রা মাহিয়ানা হইয়াছিল। অনাহার দূর হইল, অর্থের সচ্ছলতা হইল, কিন্তু সেই কঠিন পরিশ্রমে উপার্জ্জিত অর্থ কি তিনি অনেকের ন্যায় বিলাসে ব্যয়িত করিতেন, অথবা তিনি কি সেই অর্থ ব্যয় না করিয়া সঞ্চয় করিতেন? যাও—একবার তাঁহার ভবানীপুরস্থ ভবনে যাও—যাইয়া দেখ কত দুঃখী তাঁহার দ্বারে দণ্ডায়মান—তিনি দুই হস্তে তাহাদিগকে অর্থ সাহায্য করিতেছেন, কত প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণ প্রজা তাঁহার গৃহে অতিথি; তিনি কুটুম্বের ন্যায় সদ্ব্যবহারে তাহাদিগকে আহারাদি করাইতেছেন; কত দরিদ্র আত্মীয় ও বন্ধু তাঁহার অর্থে অনশন হইতে রক্ষা পাইয়াছেন তাহা তাঁহারাই জানেন; আর জানেন তিনি যিনি তাঁহাকে

ক্রোড়ে করিয়া লইয়া বৈকুণ্ঠে গিয়াছেন। মৌখিক স্বদেশ হিতৈষী তিনি ছিলেন না; তাঁহার স্বদেশ হিতৈষিতা তাঁহার শিরায় শিরায় বহমান হইত, তাহা তাঁহার হৃদয়ে হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল।

কেবল দুঃখীর দুঃখ অর্থ দিয়া অপনোদনের চেষ্টা করিয়া তিনি ক্ষান্ত থাকিতেন না; তাঁহার তেজস্বী লেখনীকেও এই মহৎ কার্য্যে উৎসর্গ করিয়া ছিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষের অনেক স্থানের, বিশেষ কলিকাতা নগরীর, প্রায় অধিকাংশ সম্বাদ পত্রে হরিশের মধুর জলদগম্ভীর নিনাদ ধ্বনিত হইত। অধিকাংশ পত্রিকার হরিশের লেখনি সম্ভূত অতি তেজময় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। কিন্তু এত লিখিয়াও হরিশের সন্তোষ হইত না, অপরের পত্রিকায় তিনি নিজে সম্পূর্ণ মন খুলিয়া লিখিতে পারিতেন না; এই জন্য "হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর" নামক পত্রিকার সম্পাদক বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষের সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং শীঘ্রই ইহার একজন প্রধান লেখক হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কাশীপ্রসাদ ঘোষের সহিত তাঁহার মন ও হৃদয়ের কোন মিলই ছিল না; সর্ব্ব বিষয়েই প্রায় দুই জনের মত দুই দিকে ধাবমান হইত। সুতরাং তাঁহার কাশীপ্রসাদ ঘোষের সহিত একত্রে থাকিয়া এক পত্রিকায় লেখনী সঞ্চালন একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। এই সময়ে "বেঙ্গল রেকর্ডর" নামে এক পত্র প্রচারিত হইল। হরিশ অনুরুদ্ধ হইবামাত্র ইহার সম্পাদক হইলেন। একণে যেরূপ

সম্বাদ পত্রের সম্পাদক হওয়া প্রায় একরূপ ঘোর অপ-মানের কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন সেরূপ ছিল না; তখন সম্পাদকদিগকে রাজা প্রজা উভয়েই সম্মান করিতেন। "বেঙ্গল রেকর্ডর" নাম হরিশের ভাল লাগিত না; এই জন্য তিনি ইহার সত্ত্বাধিকারীকে অনুরোধ করিয়া ইহার নাম পরিবর্ত্তন করিলেন। যে নামে তিনি তাঁহার কাগজের নাম অভিহিত করিলেন, তিনি যথার্থই সে নামের সার্থকতা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার যত্নে "হিন্দু পেট্রিয়ট" কি দেশে, কি বিদেশে কি ভারতে, কি ইংলণ্ডে সর্ব্বত্র সমভাবে সমাদর প্রাপ্ত হই-য়াছে। সকলেই জানিত যথার্থ স্বদেশহিতৈষিতা "পেট্রিয়টের" প্রতি সূত্রে প্রবাহিত হইত। পেট্-রিয়টে অতি সুন্দর প্রবন্ধ সকল লিখিত হইত, সত্য, কিন্তু সেই সময়ে সেই প্রবন্ধ পাঠের জন্য কয় জন বাঙ্গালী অর্থ প্রদান করিতে প্রস্তুত হইত? এক্ষণেই বা কয় জন এরূপ কার্য্যে অর্থ ব্যয়ে ইচ্ছুক হন? সুতরাং পেট্-রিয়টের সত্ত্বাধিকারী কয়েক মাস ধরিয়া অর্থ হানি সহ্য করিয়া অবশেষে এই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। হরিশ পত্রিকার সমস্ত ভার গ্রহণে প্রার্থী হওয়ায় তিনি সাহ্লাদে তাঁহাকে "পেট্রিয়ট" পত্রিকা দান করিলেন। হরিশ ভবানিপুরে মুদ্রাযন্ত্রাদি লইয়া ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে নিজ ভ্রাতার নামে পত্রিকা চালাইতে লাগিলেন। কয়েক মাস ধরিয়া নীরবে অর্থ হানি সহ্য করিয়াছিলেন; পরে একরূপ পেট্রিয়টকে নিজ

শক্তিতে দণ্ডায়মান থাকিবার শক্তি প্রদান করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণ সকলেই তাঁহার পত্রিকার উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বেস্পাবিজ সাহেব তাঁহার পত্রিকার জন্য আবশ্যকীয় টেলিগ্রাফের সম্বাদ সকল সঞ্চয় করিয়া দিতেন। এই সকল বিষয়ের সহিত হরিশের লেখনীর তেজ সংমিলিত হইয়া শীঘ্রই হিন্দু পেট্রিয়টকে সর্ব্বত্র সমাদিত করিয়া তুলিল; অনেকেই পেট্রিয়ট পাঠ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। হরিশের পত্রিকার গ্রাহক বৃদ্ধি হইতে লাগিল; শীঘ্রই তিনি পেট্রিয়টকে লোভাজনক করিয়া তুলিলেন। যখন বঙ্গদেশে সম্বাদ পত্র পাঠ করিবার লোক ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তখন হরিশের তেজে লোক সম্বাদ পত্র পাঠে অনুরক্ত হইল, হরিশের পত্রিকা পাঠের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে কেহ আর ক্লেশ অনুভব করিত না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সহসা বারাকপুরে এক মহা-অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল; সেই অগ্নি দেখিতে দেখিতে বিস্তৃত হইয়া সমস্ত ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়া ইংরাজ রাজ্য ভষ্মীভূত করিবার উপক্রম করিয়া তুলিল। সিপাহী-গণ উন্মত্ত হইয়া ইংরাজ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকেই নৃশংশ ভাবে হত্যা করিতে লাগিল—চতুর্দ্দিক আলোড়িত হইয়া উঠিল। যখন এই বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল, তখন ইংরাজেরা ক্রোধে জ্ঞান শূন্য, তাঁহারা স্থির করিলেন সমস্ত ভারতবাসী ইংরাজ রাজ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছে ও ভিতরে ভিতরে ইহার ধ্বংসের আয়োজন করিতেছে; "কোর্ট মারসাল" জারি হইল, কি দোষী কি নির্দ্দোষী কত শত লোকের দেহ পশ্চিমাঞ্চলে বৃক্ষে বৃক্ষে দোলায়মান হইল; যদি হরিশ না থাকিতেন, যদি "হিন্দু পেট্রিয়টে" তাঁহার লেখনী বাঙ্গালীদিগের নির্দ্দোষিতা ইংরাজকে না বুঝাইতে পারিত, তবে হয়তো কত বাঙ্গালীর দেহও গঙ্গার দুই কূলে বৃক্ষশাখায় লম্ববান হইত। বাঙ্গালীর জন্য হরিশ যাহা করিয়া গিয়াছেন আর কেহ তেমন কখন করে নাই। আর কখনও যে তাঁহার ন্যায় স্বদেশ হিতৈষী এই অতি-সম্পাতগ্রস্থ দেশে জন্মিবে সে আশাও আমরা করি না। যদি ইংরাজেরা সমস্ত বাঙ্গালীর মার্জ্জনার জন্য

এক জন বাঙ্গালীর প্রাণ দণ্ড করিবার প্রস্তাব করিতেন তাহা হইলে হরিশ আনন্দে সেই বাঙ্গালী হইয়া স্বদেশীয়ের প্রাণ রক্ষার জন্য নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিতেন। আর তাহাই কি তিনি করেন নাই? কাহার জন্য তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া অসময়ে প্রাণত্যাগ করিলেন? কেন তিনি কেবল সাঁয়ত্রিশ বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন?

তিনি মহা পণ্ডিত ছিলেন; তাঁহার মত লেখনীর তেজ আর কাহারও লেখনীতে ছিল না, এখনও নাই। ইংরাজ রাজনীতি তাঁহার জিহ্বাগ্রে রহিত, ইংরাজী ভাষায় তিনি অদ্বিতীয় অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, এই সকল পাণ্ডিত্যের জন্য কি আমরা তাঁহার জীবনী দেশ মধ্যে প্রচার করিতেছি; তাহা নহে। তাঁহাপেক্ষাও পণ্ডিত বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম মনে করিতেন, তিনি যে স্বদেশীয় দিগের ক্লেশে ক্রন্দন সম্বরণ করিতে পরিতেন না, তিনি যে দুঃখীর দুঃখ দূর করিতে গিয়া প্রাণ উৎসর্গ করিলেন! এই জন্যই তাঁহাকে আমরা পূজা করি, এই জন্য এই চিত্র স্বদেশবাসীর সম্মুখে উন্মুক্ত করিবার জন্যই আমরা আজ প্রয়াস পাইতেছি।

কেবল পত্রিকায় লিখিয়াই তিনি নিরস্ত রহেন নাই। তিনি ভবানিপুরে এক সভা প্রতিষ্ঠিত করেন, এতদ্ব্যতীত তিনি ভারতবর্ষীয় সভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। কত পরিশ্রম তিনি দেশের জন্য করিতেন তাহা তাঁহার

অভাগিনী মাতা জন্মভূমিই জানেন। কত লোকের আবেদন পত্র তাঁহাকে প্রতিদিন লিখিতে হইত, কত লোকের জন্য তাঁহার প্রত্যহ অর্থ ব্যয় করিতে হইত, তাহা তিনিই জানেন। শোণিত ব্যয় করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন তাঁহার শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত স্বদেশের ও স্বদেশবাসীদিগের জন্য তিনি ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি যেমন স্বদেশ ও স্বদেশীয়ের জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বদেশও তাঁহাকে—তাঁহার উপযুক্ত সম্মান না করিতে পারে,—তাঁহার অসম্মান করেন নাই। বিদ্যায়, দয়ায় ও স্বদেশ হিতৈষিতায় তিনি বড়, তাঁহাকে বড়লোক বলিয়া অস্বীকার করিবে কে?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে হরিশ কেবল সংবাদ পত্রে লিখিয়া বা পরের জন্য খাটিয়া নিরস্ত ছিলেন না। ভারতবর্ষে ইংরাজ পতাকা কিরূপে প্রথিত হইল, আর কিরূপেই বা ধীরে ধীরে ব্রিটেন্ রাজ্য ভারতে বিস্তৃত হইল এই বিষয় লইয়া তিনি এক বৃহৎ ইতিহাস রচনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি যত এই সকল ঘটনা সম্বন্ধীয় কাগজাদি পাঠ করিয়াছিলেন এমন আর কেহই করেন নাই; তাঁহার রচিত ইতিহাস যত মনোহর হইত এমন আর কাহারই হইত না; কিন্তু হায়!—কাল তাঁহাকে তাহা করিতে দিল কই—নিষ্ঠুর সর্ব্বধ্বংসকারি কাল তাঁহার ইচ্ছা পুর্ণ না হইতে হইতেই তাঁহার কালপুর্ণ করিল।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইংরেজগণ বঙ্গদেশের নানা স্থানে কুটী স্থাপন করিয়া নীল প্রস্তুত করিতেছিলেন। কুটীর অধ্যক্ষগণ প্রায়ই উষ্ণ রক্ত যুবক—দেশ হইতে বিদেশে বহুদূরে আসিয়া মস্তক স্থির রাখিতে না পারিয়া তাঁহারা প্রজাদিগের উপর অনর্থক অত্যাচার করিতেন, বল প্রকাশ পূর্ব্বক অনেককে নীলের চাস করাইতেন,—রীতিমত তাহাদিগের পারিশ্রমিক প্রদান করিতেন না। কেহ তাঁহাদিগের আজ্ঞা লঙ্ঘনে সাহসী হইলে তাহার উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতেন। সে সকল অত্যাচারের কথা বর্ণনা করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। অন্য আর কি বলিব,

তাঁহারা সতীর সতীত্ব নষ্ট করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহারা অত্যাচার করিলেও দণ্ডিত হয়েন না দেখিয়া তাঁহাদের সাহস ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল,—অত্যাচারও ক্রমে ভয়ানক আকার ধারণ করিল। পরে এত দূর হইয়া দাঁড়াইল যে নিরীহ, শান্ত, ভীতচিত্ত, দুর্ব্বল, অনাহারী বঙ্গের কৃষকেরাও আর সহ্য করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইল,—দেখিতে দেখিতে বঙ্গের নানা প্রদেশের কৃষকগণ দল বদ্ধ হইয়া নীলকরদিগের বিরুদ্ধে উত্থান করিল। নীল চাস একেবারে বন্ধ হইল;—কোন কোন স্থলে অত্যাচারী সাহেবের উপর যথেষ্ট প্রতিহিংসা বৃত্তিও তাহারা চরিতার্থ করিতে লাগিল। সাহেবরাও রাক্ষসরূপ ধারণ করিলেন; অত্যাচার দ্বিগুণিত হইল। অনেক সাহেব মেম আহত ও হত হইলেন, অনেক কৃষকেরও ঐরূপ দুর্দ্দশা হইল। এক স্থানে এক সাহেব এক কৃষকের মস্তকে নীল বুনিয়াছিলেন। এই সময়ে হরিশ দুর্ব্বলের পক্ষ গ্রহণ করিলেন, উৎপীড়িত প্রজার হইয়া স্বতেজে লেখনী চালনা করিতে লাগিলেন, দুই বৎসর ধরিয়া তিনি এই সকল অভাগা দিগের জন্য এত পরিশ্রম করিয়াছিলেন যে তাহা বর্ণন করা অসাধ্য; এই পরিশ্রমই তাঁহাকে অকালে পৃথিবী হইতে লইয়া গেল। প্রত্যহ তাঁহার দ্বারে অসংখ্য প্রজা আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিত, তিনি জীবন দিয়া এই সকল অভাগাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। বঙ্গের কৃষকেরা কি তাঁহার এই কার্য্য বিস্মরণ হইয়াছে? যাও দূর

পল্লিগ্রামস্থ প্রান্তরে যাও---দেখিবে এখনও কৃষকেরা সন্ধ্যাকালে বাটী ফিরিতে ফিরিতে গাইতেছে।

"ভাস্‌ছে মন মনের হরিষে
আগে লুটে খেত এক হরিষে,
এখন বাঁচালে এক হরিশে
বুনে বুনে নীল, কর্ত্তু জমী খিল
এখন হতেছে তায়, অড়র, কলাই, শরিষে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উৎপীড়িতগণকে রক্ষা করিতে যাইয়া হরিশ পীড়িত হইলেন। ক্রমে পীড়ার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মৃত্যু-শয্যায় শুনিলেন যে বিলাত হইতে প্রজাদিগের উপর ন্যায় বিচার হইয়াছে। সেই মৃত্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত বদনে একবার আমোদের হাসি দেখা দিল,—হরিশ চক্ষু মুদ্রিত করিলেন; প্রথমে গৃহে, পরে ভবানীপুরে, পরে সমস্ত কলিকাতা নগরীতে—অবশেষে সমস্ত বঙ্গদেশে ক্রন্দনের রোল উঠিল। হরিশ আর নাই। ১২৬৮ সালের ১২ই আষাঢ় কেবল সপ্তত্রিংশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমে হরিশ প্রাণত্যাগ করিলেন। বীর-প্রসবিনী রাজস্থানে প্রতাপ সিংহ নিজ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজপুত্র হইয়া ভিখারীর বেশে বনে বনে বিচরণ করিয়াছিলেন, পরে জন্ম ভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করিতে করিতে কুটীরে প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিলেন, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি আমা-দের হরিশও কি সেই মহাবীরের ন্যায় স্বদেশের ও স্বদেশীয়ের উদ্ধার ও রক্ষা সাধনার্থে প্রাণ দান করি-লেন না? প্রতাপ সিংহ যবন রক্তে রঞ্জিত অসি হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন, আর হরিশ্চন্দ্র—লেখনী হস্তে উৎ-পীড়িতের রক্ষা সাধন করিতে করিতে মানবলীলা সম্ব-রণ করিলেন। তিনি উন্নতোন্মুখ বঙ্গসন্তানগণকে স্বদেশ-প্রেম শিক্ষা দিবার জন্য অবনীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া-

ছিলেন,—কিরূপে প্রাণ দিয়া স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হয়, কিরূপে স্বদেশবাসীর উন্নতির পথ মুক্ত করিতে হয়, আর কিরূপে উৎপীড়িতের রক্ষা করিতে হয়, তিনি আমাদিগকে তাহাই দেখাইয়া গিয়াছেন। বঙ্গভূমে বীর জন্ম গ্রহণ করেন নাই—এ কথা যিনি বলেন তিনি অন্ধ। দেখাও কে প্যার, সমস্ত পৃথিবী অনুসন্ধান করিয়া দেখাও, হরিশের মত বীর আমাকে এক শত জন দেখাও, আমি নীরব হইব।

হায়! হরিশ, তুমি আরও দিনকয়েক যদি বাঁচিয়া থাইতে তাহা হইলে আমাদিগের কতক ক্লেশ দূর হইত। যদি আরও দিন কয়েক থাকিতে তাহা হইলে তোমাকে একবার প্রাণ ভরিয়া পূজা করিয়া লইতাম। আইস, হে বঙ্গবাসী! দেখিতেছতো কি দেশের দুর্দ্দশা, দেখিতেছতো, অভাগিনী জন্মভূমি ফুকারিয়া দিন রাতি কাঁদিতেছে; আর কেন, আইস, হরিশ যে পথ দেখাইয়া গিয়াছেন, সেই পথে অগ্রসর হই। তিনি আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করাইতে আসিয়া ছিলেন; তাঁহার কার্য্য শেষ করিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন, আইস এক্ষণে আমরা আমাদের কার্য্য করি।

রামগোপাল ঘোষ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

যিনি বঙ্গদেশে প্রথম উত্তেজনার পথ প্রদর্শন করাইলেন, যিনি চিন্তাশীল। ভারতে চিন্তার বেগ অন্য হৃদয়ে অঙ্কিত করিবার পথে প্রথম অগ্রসর হইয়া সমস্ত বঙ্গদেশকে নিজ তেজস্বিনী বক্তৃতায় মুগ্ধ করিয়াছিলেন, যাঁহার নামে শাসনকর্ত্তাগণ ভীত হইতেন সেই রামগোপাল ঘোষ ১৮১৫খ্রীষ্টাব্দে (১২২০ সালে) কলিকাতা নগরীতে গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের বাটীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতা গোবিন্দ চন্দ্রের সংসারিক সচ্ছলতা তত ছিল না, তিনি কলিকাতার কোন সওদাগরের আফিসে সামান্য কার্য্য মাত্র করিতেন।

এই সময়ে মহানুভব ডেভিড্‌ হেয়ারের প্রযত্নে বঙ্গবাসীকে উপযুক্ত রূপ ইংরাজি শিক্ষা দিবার জন্য হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। নয় বৎসর বয়সে রামগোপাল হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন; পুত্রের পাঠে আন্তরিক যত্ন দেখিয়া পিতা অসচ্ছল সত্বেও পুত্রকে হিন্দুকলেজে প্রেরণ করিলেন। অতি শৈশবে যখন তিনি ইংরাজি ভাষার বর্ণ পরিচয় মাত্র পাঠ করিতেছিলেন সেই সময়েও বালক রামগোপাল এমন সুন্দর ইংরাজি ভাষার অনুকরণ করিয়া বক্তৃতা করিতেন যে সকলেই শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। তিনি অতি যত্নের সহিত ইংরাজি ভাষার এক পুস্তক হইতে

হইতে অন্য পুস্তক পাঠ শেষ করিতে লাগিলেন। ডেভিড হেয়ার তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন; রামগোপালের পিতা পুত্রের বেতন দিতে অতিশয় কষ্ট পান দেখিয়া তিনি রামগোপালকে হিন্দুকলেজের এক জন অবৈতনিক ছাত্র রূপে গণ্য করিয়া লইলেন। দরিদ্র হইয়া যে জ্ঞানোপার্জ্জনে ব্যাকুল হইয়া বেড়ায় সে যদি সেই জ্ঞানোপার্জ্জনে কাহারও দ্বারা উৎসাহিত হয় তবে সে যে কত পরিশ্রম ও উৎসাহের সহিত সেই বিষয়ে আপনার মন ও প্রাণ নিযুক্ত করে তাহা যে রামগোপালের অবস্থায় কোন দিন পড়িয়াছে সেই জানিতে ও বুঝিতে পারিবে। রামগোপাল সর্ব্বদাই ইচ্ছা করিতেছিলেন যে শীঘ্র শীঘ্র বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়া কোনরূপ কাজ কর্ম্ম করিয়া পিতার অসচ্ছল দূর করিবেন। তিনি কত দূর এই বিষয়ে মন নিবিষ্ট করিয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত করিবার পক্ষে বোধ হয় ইহাই যথেষ্ট হইবে যে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে না হইতে তিনি হিন্দুকলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন।

এই সময়ে ডিরোজিও নামে একজন অতি বিদ্বান শিক্ষক হিন্দুকলেজের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে শিক্ষা দান করিতেন। দার্শনিক গ্রন্থ সকল তাঁহার বিশেষ রূপ পাঠ করা ছিল, তিনি নিজেও একজন অতিশয় চিন্তাশীল ব্যক্তি ছিলেন, এতদ্ব্যতীত তিনি একজন সুকবি। তাঁহার কবিতা এখনও সকলে আহ্লাদে পাঠ করিয়া থাকে। এক্ষণে যেরূপ ইংরাজ বাঙ্গালী

মাত্রকেই ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, পারতপক্ষে বাঙ্গালীর সংস্পর্শ রাখিতে চাহেন না, তখন সেরূপ ছিল না, তখন এ শত্রুতার বীজ রোপিত হয় নাই, ডিরোজিও নিজের ছাত্রদিগকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন, তাহারাও তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত। তিনি বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পুস্তক পাঠ করাইয়া সন্তোষ প্রাপ্ত হইতেন না; এই জন্য কয়েকজন ছাত্র লইয়া একটী দল করিলেন ও তাহাদিগকে কঠিন কঠিন পুস্তক পাঠ করাইতে লাগিলেন এবং কঠিন বিষয় সকল শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ডিরোজিওর এই দলে যাঁহারা যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা সকলেই স্বদেশে নাম চিরস্থায়ী করিয়াছেন। ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিকলাল মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি যাঁহারা যাঁহারা সেই সময়ে হিন্দুকলেজে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পরে যশ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন সকলেই ডিরোজিওর শিষ্য ছিলেন।

ডিরোজিওর শিক্ষায় ইহাঁদের মানসিক উন্নতি ও জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত হইল সত্য, কিন্তু জাতীয় আচার ব্যবহারের প্রতি বিশেষ অনাস্থা জন্মিতে লাগিল। ইহাঁরাই দেশে ইংরাজি আহার ব্যবহারকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন, ইহাঁরাই দেশে সুরা রাক্ষসীকে দূর বিদেশ হইতে আনিয়া ছাড়িয়া দিলেন। আজ রাক্ষসী ভারতের গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়া ভারতের সর্ব্বনাশ করিতেছে; হায়! তোমরা দেশের অনেক উপকার করিয়াছ

সন্দেহ নাই, কিন্তু এ রাক্ষসীকে স্থান দান করিয়া যে মহা কলঙ্ক করিয়াছ তাহা তোমাদের কখন অপনোদিত হইবে না। এখনো হয়তো অনেকে জীবিত আছেন যাঁহারা এই সকল "ডিরোজিও ছাত্রদিগকে" কলিকাতার রাজপথে চিৎকার করিয়া বলিতে শুনিয়াছেন "আমি গরু খাই, আমি সুরাপান করি।" বাল সুলভ চপলতা বশতঃ ইহারা যাহা করিয়াছিলেন দেশের তাহাতে সর্ব্বনাশ হইয়াছে—তাঁহাদিগের এই উন্মত্ত ব্যবহারের জন্য ডিরোজিওর এ বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। "ডিরোজিও শিষ্যদিগের" কার্য্যে হিন্দু সমাজে ঘোর বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল;—অবশেষে হিন্দুকলেজের অধ্যক্ষগণ ডিরোজিওকে বিদায় দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে ছাড়িলেন না, অনেকে বাগবাজার হইতে বালিগঞ্জে যাইয়া তাঁহার উপদেশ শিক্ষা করিতেন; ইহার মধ্যে রামগোপালও একজন ছিলেন। ডিরোজিওর শিক্ষায় তাঁহাদের আচার ব্যবহার ভ্রষ্ট হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহাও বলিতে হয় ডিরোজিওর উপদেশ না পাইলে তাঁহারা কখনই যাহা হইয়াছিলেন, তাহা হইতে পারিতেন না। তাঁহারা যেরূপ কয়জনই একরূপ শিক্ষা পাইয়া একরূপ পদবিক্ষেপে যশের মন্দিরে নীত হইয়াছিলেন কই এখনতো তেমন আর হয় না। তাহার কারণ সে কালে আর এ কালে সর্ব্ব বিষয়েই অনেক প্রভেদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ডিরোজিও কলেজ হইতে বিদূরিত হইলে তাঁহার

শিষ্যেরা সকলেই কলেজ ত্যাগ করিলেন। রামগোপালও হিন্দুকলেজ হইতে বিদায় লইয়া কার্য্যের চেষ্টায় বহির্গত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জোসেফ নামক একজন ইহুদি বণিক ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে কলভিন কুটির অধ্যক্ষ এণ্ডারসন সাহেবের নিকট একজন কর্ম্মদক্ষ লোক প্রার্থনা করেন। তিনি হেয়ার সাহেবকে হিন্দুকলেজ হইতে একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র পাঠাইতে অনুরোধ করেন। হেয়ার রামগোপালকে বিশেষ স্নেহ করিতেন, তিনি জানিতেন তাঁহার মত কার্য্যক্ষম ও পরিশ্রমী লোক আর অল্পই আছে, সুতরাং তিনি রামগোপালকে এই কার্য্যের জন্য মনোনীত করিয়া এণ্ডারসনের নিকট প্রেরণ করিলেন। রামগোপাল জোসেকের আফিসে নিযুক্ত হইলেন; এইরূপে সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন—অদ্য তিনি সামান্য বেতন ভোগী—কয়েক বৎসর পরে তিনি জোসেফের ন্যায় বণিকের সমকক্ষ হইয়াছিলেন। পরিশ্রম, বুদ্ধি ও মিতব্যয় যথায়, লক্ষ্মীর সাধ্য কি যে তি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া যান।

কয়েক মাসের মধ্যেই রামগোপাল প্রভুর বিশেষ প্রিয়পাত্র হইলেন; তাঁহার আদেশে তিনি এ দেশের শিল্প জাত দ্রব্যের একটী বিবরণী এমন সুন্দর রূপে

লিখিয়াছিলেন যে তাহাতে কেবল যে নিজ প্রভুর উপকার হইয়াছিল এরূপ নহে, সমস্ত বণিকেরই বিশেষ উপকার হইয়াছিল। তিনি ইহা দ্বারা প্রভুর অতিশয় প্রিয় হইলেন, যদি বয়স অল্প না হইত তাহা হইলে তিনি এই সময়ে "মুচ্ছুদ্দি" হইতে পারিতেন। নিতান্ত তাঁহার বয়ঃক্রম অল্প হওয়ায় জোসেফ তাঁহাকে সহকারী মুচ্ছুদ্দি নিযুক্ত করিলেন।

বাণিজ্যের কুটিল প্রবাহে নিক্ষিপ্ত হইয়া তিনি তাঁহার চির প্রিয় জ্ঞান উপার্জ্জন পরিত্যাগ করেন নাই। বাড়ীতে ইংরাজি ভাষার সুন্দর সুন্দর পুস্তক সকল বিশেষ যত্নের সহিত পাঠ করিতেন। কবিকুলচূড়ামণি সেক্সপিয়র তাঁহার বড় আদরের সামগ্রী ছিল। তিনি প্রতি শনিবার আফিসের কার্য্য শেষ করিয়া হিন্দুকলেজে যাইয়া স্মিত সাহেবের উপদেশ শ্রবণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত মাণিকতলার বাবু শ্রীকৃষ্ণ মল্লিকের বাগানে "সাহিত্য সমালোচনী" সভার প্রত্যেক অধিবেশনে রীতিমত উপস্থিত থাকিতেন। এ সভার প্রতি তাঁহার মন আকৃষ্ট হইবার কারণ ছিল, এই সভার সভাপতি তাঁহার প্রিয় ডিরোজিও সাহেব ছিলেন। এই সময়ে বাবু রসিককৃষ্ণ মল্লিক "এনকোয়ারার" নামক পত্রিকা প্রকাশ করিতেছিলেন। দেশীয় বাণিজ্য ও রাজনীতির উপর যে সকল সুন্দর প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল সকলই রামগোপালের লেখনী প্রসূত। এই সময়ে গভর্মেণ্ট আমদানী দ্রব্যের উপর শুল্ক রহিত করেন, ইহার কারণও রাম-

গোপাল। এই সময়ে তিনি "সিভিস" নাম স্বাক্ষর করিয়া এই বিষয়ের উপর একটী অতি সুন্দর যুক্তিপূর্ণ পত্র প্রকাশ করেন; গভর্মেণ্ট যে তাঁহার যুক্তিতে মত পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারাই স্বীকার করিয়াছেন।

"এনকোয়ারার" বন্ধ হইলে তিনি বাবু কিশোরিচাঁদ মিত্রের "বেঙ্গল স্পেক্টেটর" নামক পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কেবল লিখিয়া তাঁহার সন্তোষ হইত না, তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা বলিতে ব্যাকুল হইত; তিনি সর্ব্বদাই লোককে তাঁহার তেজস্বিনী উত্তেজনায় মাতাইতে চাহিতেন। এই জন্য এই সময়ে আর এক সভা স্থাপন করিলেন; এই সভার অধিবেশন হিন্দুকলেজের "হলে" হইত। এই সভার সভ্য গণের মধ্যে অধিকাংশই 'বড়লোক" বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন; সুতরাং ইহাঁকে আমরা বঙ্গদেশে "উত্তেজনা" অগ্নির প্রথম ভূমি বলিতে পারি। বক্তৃতা প্রথা এ দেশে প্রচলিত এই সভা হইতেই হইয়াছিল; এই সভাতেই প্রথম রামগোপালের গম্ভীর নিনাদ শ্রুত হইয়াছিল। যখন রামগোপাল ও তাঁহার সহযোগীগণ এই সভায় ভারতে বক্তৃতার বীজ বপন করিতেছিলেন, সেই সময় পালিয়ামেণ্টের সভ্য বিখ্যাতবাগ্মী জর্জটমসন দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত এ দেশে আসিলেন। তাঁহার নাম ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তির অবিদিত ছিল না; রামগোপাল ইহাঁর আগমন বার্ত্তা শ্রবণ মাত্র ইহাঁকে মহা সমাদরে সভায় অভ্যর্থনা করিলেন। টমসন অতি তেজস্বী এক বক্তৃতা করিলেন, সেরূপ বক্তৃতা বঙ্গদেশে পূর্ব্বে

আর কখন হয় নাই, রামগোপাল ও তাঁহার বন্ধুগণ কখন এরূপ বাগ্মীর বক্তৃতা শ্রবণ করেন নাই, সুতরাং তাঁহারা সকলেই বিশেষ মোহিত হইলেন ও অনেক শিক্ষা লাভ করিলেন। পর দিবসই সভার নাম ও কার্য্য প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইল। এখন হইতে ইহার নাম "বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী" হইল। সময়ে এই সভা এতদূর উন্নত হইয়াছিল যে গর্ভমেণ্ট ইহার পরামর্শ না লইয়া কোন বিশেষ কার্য্য করিতেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যোসেফ্ রামগোপালের উপর আফিসের সমস্ত ভার ন্যস্ত করিয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে কার্য্যের বিসৃঙ্খলা হওয়া দূরে থাকুক, কখন কার্য্যের এরূপ উন্নতি লাভও হয় নাই। যোসেফ্ বিলাত হইতে প্রত্যাগম করিয়া কার্য্যবৃদ্ধির ইচ্ছা করিয়া কেলেসল নামক এক সাহেবকে অংশী রূপে গ্রহণ করিলেন এবং রামগোপালকে এই কারবের মুচ্ছুদ্দি নিযুক্ত করিলেন। দিন দিন ব্যবসার বৃদ্ধি হইতে লাগিল, দিন দিন কার্য্য বিস্তৃত হইতে থাকিল; রামগোপালের কার্য্য দক্ষতায় আফিসের যথেষ্ট লাভ হইতে লাগিল। এরূপ সময়ে দুই সাহেবের মনোবাদ উপস্থিত হওয়ায়, দুই জনে পৃথক হইলেন, রামগোপাল এণ্ডরসনের পরামর্শে কেল্‌সেলের দিকে গেলেন ও তাঁহার কার্য্যের মুচ্ছুদ্দি হইলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি

কেলসেলের একজন অংশী হইলেন ও তাঁহাদিগের কার্যের নাম কেলসেল, ঘোষ এণ্ড কোং হইল।

মা লক্ষ্মী যখন যাহার উপর কৃপা দৃষ্টি করেন তখন সে দুই হস্তে অর্থ সঞ্চয় করিয়াও সকল একত্রিত করিতে পারে না। রামগোপালেরও তাহাই হইল। এক সময়ে যে পিতার ক্লেশ দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন পিতার অবস্থা সচ্ছল করিবেন তাহা এক্ষণে করিলেন। তিনি কলিকাতার মধ্যে এক্ষণে একজন ধনী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ১২৫৭ সালে "ট্রেডস্ এসোসিএসন" তাঁহাকে সভ্য মনোনীত করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার উপর সম্মান অর্পণ হইতে লাগিল। যেমন অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, তেমনি মুক্ত হস্তে ব্যয় করিতেও লাগিলেন। সেই সময়ে তাঁহার মত "বাবু" কলিকাতার কেহ ছিল না; তাঁহার শকট ও তেজস্বী অশ্ব দেখিলেই লোকে চিনিতে পারিত। গঙ্গার বক্ষে তাঁহার প্রমোদ ষ্টিমার 'লোটাস' সকলের মনঃরঞ্জন করিত; তিনি কলিকাতার গোলযোগের বাহিরে কামারহাটী নামক স্থানে এক উদ্যানে মহা বিলাসে বাস করিতেন। বন্ধু বান্ধবদিগকে পরিতোষ রূপ আহার করাইতেও তাঁহার মত কেহ জানিত না। কামারহাটি উদ্যানে প্রায়ই মহা ভোজ হইত।

তিনি যেরূপ নিজ সুখ সচ্ছন্দের জন্য মুক্ত হস্তে অর্থ ব্যয় করিতেন, তেমনি বন্ধু বান্ধবদিগের জন্য, স্বদেশ ও স্বদেশীয়ের জন্য এবং দরিদ্রের জন্যও ব্যয় করিতেন। তিনি বর্ষে বর্ষে হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে যাঁহারা

পরীক্ষায় ভাল হইতেন তাঁহাদের বহুসংখ্যক সুবর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত মেডাল পারিতোষিক রূপে প্রদান করিতেন,—এক বৎসর তিনি ছাত্রদিগকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দান করিয়াছিলেন, সৎকার্য্য অনুষ্ঠানের জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থী হইলে তিনি কখন বঞ্চিত করিতেন না। সেই সময়ে যে কোন মঙ্গল কার্য্য হইয়াছিল রামগোপালের অর্থ তাহার সর্ব্বত্রই ব্যয়িত হইয়াছে। সুরা রাক্ষসীকে দেশে আনয়ন করিয়া যে পাপ করিয়াছিলেন, দেশের শত সহস্র মঙ্গল কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া তিনি তাহার সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন।

১৮৪৮খ্রীষ্টাব্দে কেল্‌সেলের সহিত তাঁহার মনোবাদ উপস্থিত হইল। তিনি দুই লক্ষ মুদ্রা লইয়া কেল্‌সেলের কারম হইতে প্রভেদ হইলেন ও ভাবিতে লাগিলেন যে এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য। তাঁহার মত মুক্তহস্ত লোকের দুই লক্ষ মুদ্রায় কয় দিবস চলে। তিনি পরামর্শের জন্য এণ্ডারসন সাহেবকে বিলাতে পত্র লিখিলেন। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে কলিকাতার স্মল কস কোর্টের বিচারপতি হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু রামগোপাল এ পদ গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। যিনি স্বাধীনতার মধুর আস্বাদ পাইয়াছিলেন তিনি কেন জানিয়া পরের দাস হইতে যাইবেন। এণ্ডারসনের পরামর্শ পাইয়া তিনি নিজে স্বাধীন ভাবে বাণিজ্য করিতে মনস্থ করিয়া "আর, জি, ঘোষ এণ্ড কোং" নাম দিয়া এক কারম খুলিলেন। তাঁহার ন্যায় সত্যপ্রিয়, পরিশ্রমী, এবং কার্য্যক্ষম ব্যক্তি

যদি ব্যবসার উন্নতি না করিতে পারিবে তবে পারিবে কে? তাঁহার কথায় বিশ্বাস সকলই করিত; এক সময়ে একজন ধনী তাঁহাকে বিনা খতে ও বিনা বন্ধকে এক লক্ষ মুদ্রা কর্জ্জ দিয়াছিলেন; ইহাপেক্ষা তাঁহার সত্যপ্রিয়তার আর প্রমাণ অধিক কি হইতে পারে? নানা স্থানে তিনি তাহার ফারমের শাখা কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন; শত ধারে অর্থ আসিয়া বৃষ্টি ধারার ন্যায় তাঁহার অঙ্কে পতিত হইতে লাগিল। লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই তাঁহাকে অনুগ্রহ করিলেন, দেশে ও বিদেশে তিনি ধনী ও বিজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

অর্থ সঞ্চয় করিলে লোকে অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়—কয় জন মুক্ত হস্তে স্বদেশের উপকারের জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে? তাঁহার অর্থে কত দুঃখীর সন্তান বিদ্যা শিক্ষা করিয়া মানুষ হইয়াছে, তাঁহার অর্থে কত স্থানে কত বিদ্যালয় হইয়াছে, কত লোক কত উপকার পাইয়াছে। তাঁহার অর্থে কত জন আমোদ লাভ করিয়াছে, তাঁহার সুন্দর "লোটাসে" কত দিন কত সাহেব বাঙ্গালী একত্রে আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহার প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় ও নন্দন তুল্য উদ্যানে কত জন কতদিন আমোদ সাগরে ভাসিয়াছেন। মৃত্যুকালেও তিনি বন্ধু বান্ধব ও স্বদেশের জন্য অর্থ দান করিতে ভুলেন নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অদ্য যে রূপ সাহেব ও বাঙ্গালীর মধ্যে ঘোর মনোবাদ উপস্থিত হইয়াছে; অদ্য যে রূপ ইংরেজ ও ভারত বাসীর মধ্যে শত্রুতার অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে, রামগোপালের সময়ও ঠিক একবার সেইরূপ হইয়াছিল;—অদ্যও যে কারণ, সেই সময়েও সেই কারণ। সাহেবেরা বাঙ্গালীকে উচ্চপদ দিতে সম্মত নহেন, বাঙ্গালীকে সমকক্ষ মনে করিতে প্রস্তুত নহেন, বাঙ্গালীকে ও ইংরাজকে এক আইনানুসারে দণ্ডিত হইতে দেখিতে চাহেন না। গভর্ণমেণ্ট সেই সময়ে —সে আজ প্রায় ৩০ বৎসর হইল—এ দেশীয় ও ইংরেজ দিগকে এক ফৌজদারী কার্য্য বিধির অধীন করিবার প্রস্তাব করিতে ছিলেন, রামগোপাল ও তাঁহার সভা গভর্ণমেণ্টকে এই মহৎ কার্য্যে উৎসাহিত করিতেছিলেন; সভায় সুতীক্ষ্ণ বক্তৃতা করিতেছিলেন, পত্রিকায় তেজস্বিনী লেখনী যুক্ত ভাবে সঞ্চালন করিতেছিলেন; সাহেবেরা দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাকে প্রধান শত্রু মনে করিলেন; যিনি সাহেবদিগের এক রূপ সহায় ছিলেন তিনি স্বদেশের জন্য যে রূপে সেই সাহেব দিগকে কেবল ত্যাগ নহে, যে রূপে তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিলেন তাহা বঙ্গ ভূমি কখন বিস্মৃত হইবে না। তিনি স্বদেশীয় দিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া এক বৃহৎ পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করিলেন। সাহেবেরা কৃষ্ণকায় বাঙ্গালী কর্তৃক ইহা লিখিত বলিয়া ইহাকে "ব্লাক এক্ট"

বলিলেন। এখনও রাম গোপালের এই বিখ্যাত পুস্তক ব্লাক এক্ট নামে অভিহিত রহিয়াছে। এইরূপে সকল সভায় সকল স্বদেশ হিতৈষী কার্য্যে, বিশেষ বিদ্যা শিক্ষা ভারতে অধিকতর প্রচলিত হইবার বিষয়ে রামগোপাল সর্ব্বাগ্রে নিজ অর্থ ও জিহ্বা লইয়া অগ্রসর হইতেন। তিনি একরূপ দুষ্টের ভীতির কারণ হইয়া উঠিয়াছিলেন; দোষ দেখিলে তিনি কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া কথা কহিতেন না।

১৮৫৩খ্রীষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্টে ভারতবর্ষীয় শাসন প্রণালী সম্বন্ধে আন্দোলন হইল। রাম গোপাল সময় বুঝিয়া কলিকাতার "টাউনহলে" এক মহাসভা আহুত করিলেন; পণ্ডিত প্রবর হিন্দু সমাজপতি রাজা সার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। রামগোপালের বক্তৃতা শুনিতে সে দিন "টাউনহলে" লোক ধরে নাই—দশ সহস্রেরও অধিক লোক সেই দিবস তথায় একত্রিত হইয়াছিল। এক চেয়ারের উপর দণ্ডায়মান হইয়া যখন রামগোপাল ঘোষ স্বদেশীয়ের জন্য উত্তেজনাপূর্ণ বাক্য সকল উচ্চারিত করিতে লাগিলেন—তাঁহার সুমিষ্ট স্বর চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল—শ্রোতাগণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল, সেই প্রথম বাঙ্গালী বৃহৎ সভামধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা দিল, সেই প্রথম বাঙ্গালী বক্তৃতা [illegible] টাউনহল এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত কম্পিত হইতে লাগিল। রামগোপাল, তুমি যে রূপ কাজ করিয়াছিলে আর একজন তেমনই শেষ করিয়া গিয়াছেন—রাজা দিগম্বর মিত্র-

পরে টাউনহলে আবার তোমাদিগের স্বর ধ্বনিত হইবে তাহা বিধাতা ভিন্ন আর কে আমাকে বলিয়া দিবে। যখন রামগোপাল বক্তৃতা শেষ করিয়া উপবেশন করিলেন তখন সমস্ত হল প্রশংসাবাদে পূর্ণ হইয়া গেল। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর গাত্রোত্থান করিয়া রামগোপালকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "বৎস, ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘায়ু করুন, তুমি এইরূপে চিরকাল স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল কর এবং স্বদেশীয়ের হিত সাধন কর।" এই বক্তৃতা মুদ্রিত হইয়া বিলাত গমন করিল, তথায় ইংরেজ রাজ-নীতিজ্ঞগণ সকলই ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন।

কলিকাতার মিউনিসিপালটী নিমতলার শব দাহন ঘাট কলিকাতা হইতে দূরীকৃত করিবার প্রস্তাব করিলেন। ইহাতে হিন্দুমাত্রেরই বিশেষ ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং রামগোপাল আর নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না; স্বতেজে ইহার প্রতিবাদ করিলেন, তাঁহারই জয় হইল, নিমতলা ঘাট নিমতলাতেই রহিল। অদ্য যে সুন্দর অট্টালিকার সমূহ ঘাট তোমরা দেখিতেছ তাহা রামগোপালের অর্থেই রক্ষিত। ইহাতে যে কত লোকের কত উপকার করিতেছে, তাহা কলিকাতাবাসী মাত্রকেই জিজ্ঞাসা কর। হায়! বাঙ্গালী, তুমি বিদেশীয়ের প্রতিমূর্ত্তির জন্য অনর্গল অর্থব্যয় করিতেছ; একবার কি এই নিমতলার শবদাহন ঘাটে এই মহাপুরুষের এক সুবর্ণ মূর্ত্তি স্থাপন করিবার ইচ্ছাও তোমাদের মনে উদিত হয় না? বাঙ্গালী এখনও কি মহৎলোকের সম্মান করিতে শিখে নাই?

যখন তিনি পীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন, যখন পীড়ার যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছিলেন সেই সময়ে শুনিলেন যে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত ব্যক্তিদিগকে খৃষ্টান করিবার প্রস্তাব হইতেছে; তিনি ইহা শ্রবণ করিয়া আর থাকিতে পারিলেন না; বন্ধুবান্ধবদিগকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন "আমাকে তাঁহাদিগের নিকট লইয়া চল, আমি হয়তো এ নিয়ম রহিত করিতে পারিব।" দেখ, হে বঙ্গবাসী, তোমাদের জন্য মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও এ ব্যক্তি কি করিয়াছিলেন; এরূপ রত্ন আর কি বঙ্গে জন্মিবে, আর কি কখন এমন সন্তান পাইয়া দুঃখিনীবঙ্গ সকল দুঃখ ভুলিতে পারিবে!

১২৭৩ সালে যখন বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী সর্ব্বনাশ করিতেছিল, যখন অনাহারে কোটি কোটি লোক প্রাণ-ত্যাগ করিতেছিল, যখন সতীর সতীত্ব একমুষ্টি তণ্ডুলের সহিত বিনিময় হইত, যখন পিতা স্বহস্তে পুত্রকে বিনাশ করিত, যখন বঙ্গদেশে পৈশাচিক ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, যখন বঙ্গদেশ "হা, অন্ন! হা, অন্ন!" করিয়া উন্মত্তা হইয়াছিল সেই সময়ে রামগোপাল মুক্ত হস্তে অর্থব্যয় করিয়া শত শত লোকের প্রাণ রক্ষা করিয়া-ছিলেন, সহস্র সহস্রের রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু হায় শমির অভিসম্পাত হইতে রক্ষা করে এমন সাধ্য কাহার!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যাস্তের সময় আসিল। বঙ্গের আঁধার রজনী আসিবার কাল ধীরে ধীরে উপস্থিত হইল। রামগোপাল কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না; তিনি ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে চলিলেন। কিন্তু কেহ তাঁহাকে এক মুহুর্ত্তের জন্যও ভীত হইতে দেখে নাই—তিনি পীড়ার দুঃসহ যন্ত্রণা সত্ত্বেও সহাস্য বদনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

যখন দেখিলেন আর তাঁহার এ পৃথিবীতে থাকার অধিক দিন নাই, যখন দেখিলেন তাঁহার স্বর্গে গমনের আর বিলম্ব নাই, তখন তিনি "উইল" করিলেন। তাঁহার সন্তানাদি কেহই জীবিত ছিল না, এক মাত্র অবশিষ্ট কন্যাও তাঁহার মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে প্রাণ ত্যাগ করেন। বিশ সহস্র মুদ্রা তিনি দাতব্য চিকিৎসালয়ে দান করিলেন, চল্লিশ সহস্র মুদ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদান করিলেন। তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণের নিকট তাঁহার প্রায় চল্লিশ সহস্র মুদ্রা প্রাপ্য ছিল তাহা, সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিলেন। কর্ম্মচারিগণকেও যথেষ্ট দিয়া গেলেন। মৃত্যু কালেও তিনি কাহাকেও বিস্মরণ হয়েন নাই।

১২৭৫ সালে "রামগোপাল আর নাই" বঙ্গের গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইল। কত লোক তাঁহার জন্য কাঁদিল

তাহাতো তিনি আর দেখিলেন না, যদি দেখিতেন তাহা হইলে তিনি যেরূপ দয়ালু ছিলেন তাহাতে কখনও এত লোককে কাঁদাইতে সক্ষম হইতেন না। কিন্তু হায়,— তিনি কি করিবেন,—যিনি সংসারে নর নারীকে ঘুরাইতেছেন তাঁহার ইচ্ছা সর্ব্বদাই পূর্ণ হইবে। তিনি যাহা করিবেন অবশ্য ভালর জন্যই করিবেন।

তাঁহার মৃত্যু সম্বাদে সকলই সন্তপ্ত হইলেন। তিনি যে যে সভার সভ্য ছিলেন সকল সভার সভ্যগণই তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কি ইংরেজ, কি বাঙ্গালী সকলই তাঁহার জন্য সমান দুঃখ অনুভব করিলেন; গভর্ণমেণ্ট তাঁহার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যাও, মহা পুরুষ, যাও, সেই স্থানে যাও, যেখানে জরা মৃত্যু নাই—বঙ্গবাসী তোমাকে এখনও ভাল চিনিতে পারে নাই। সময়ে পারিবে, সময়ে তাহাদিগের চক্ষুর্ন্মিলন হইবে, সময়ে তাহাদের জ্ঞানোদয় হইবে তখন তাহারা তোমার পূজা করিবে।

জষ্টিস দ্বারিকানাথ মিত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বঙ্গভূমি দরিদ্রা ও পতিতা হইলেও নিতান্ত হেয় ও অশ্রেদ্ধ নহে, ইহাই যেন জগতকে দেখাইবার জন্য বঙ্গাকাশে শত বর্ষের মধ্যে ধীরে ধীরে পাঁচটী পাঁচ প্রকারের উজ্জ্বল নক্ষত্র উদিত হইল। উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণের উচ্চাসনে উপবেশন করিয়া ন্যায় দণ্ড হস্তে সুবিচার বিতরণ করিতেও বঙ্গের সন্তান অক্ষম নহে তাহাই যেন জগতকে দেখাইবার জন্য দ্বারিকানাথ মিত্রের জন্ম হইল। অন্ধকারের গাঢ়তম ছায়ায় তিনি উদিত হইয়াছিলেন বলিয়া যে এত উজ্জ্বল আভা বিতরণে সমর্থ হইয়াছিলেন এরূপ নহে। ইংলণ্ড ও ভারত উভয়েই স্বীকার করিয়াছেন যে, যে দেশে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন সে দেশ, যে দেশই হউক না কেন, তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইয়া যায়। বঙ্গভূমি তাঁহার অকাল মৃত্যুতে শোকাতুরা হইয়া কাঁদিতেছে। বঙ্গের অসংখ্য অভাগারা ব্যাকুল মনে সেই মহাত্মার নাম স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে—কিন্তু যত দিন এই বঙ্গভূমি বিস্তৃতা পৃথিবীর এক প্রান্তে তাহার অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে ততদিন সে রাত্রিতে দিবসে, আলোকে আঁধারে দ্বারিকানাথের নাম স্মরণ করিবে; এবং সকলকে স্মরণ করাইয়া দিয়া কাঁদাইবে।

হুগলীর নিকটে জাহ্নবীকূলে আগুনসী নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লি বিদ্যমান আছে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে এই ক্ষুদ্র গ্রামে হরচন্দ্র মিত্রের বাটীতে দ্বারিকানাথ জন্ম গ্রহণ করিলেন। হরচন্দ্র হুগলীতে মোক্তারি কার্য্য করিয়া যৎকিঞ্চিৎ সংস্থান করিতেন, এবং আগুন্সীতে একরূপ সুখে সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছিলেন। কে ভাবিয়াছিল যে এই দরিদ্র মোক্তারের সন্তান একদিন ভারত বর্ষের প্রধান বিচারালয়ে উপবেশন করিয়া ন্যায় বিতরণ করিবেন; কে জানিত আগুন্সীর বালক বঙ্গদেশ পবিত্র করিবে! যে শিক্ষা ও পাণ্ডিত্য পরে সাগরপারে ব্রিটেন সন্তানগণকে স্তম্ভিত করিয়াছিল, দ্বারিকানাথের সেই শিক্ষা আগুন্সার পাঠশালার দুর্দ্দান্ত গুরু মহাশয়ের নিকট আরম্ভ হইল। যে অঙ্ক শাস্ত্রে অনুরাগ তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত সমভাবে হৃদয়ে বিদ্যমান ছিল তাহাও সেই গুরু মহাশয়ের বেত্র মহাত্ম্যে; তিনিই বেত্রবলে দ্বারিকানাথকে শুভঙ্করের সহিত পরিচিত করিয়াছিলেন; শুভঙ্কর হইতে সূত্রপাত, পরে তিনি নিউটন, কোমত, ও টিন্ড্যালকে লইয়া সমস্ত অবসর সময় অতিবাহিত করিতেন।

ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতা তাঁহাকে হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। কলেজে প্রবিষ্ট হইয়াই তিনি ৮ টাকা মাসিক বৃত্তি লাভ করিলেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কান্দির রাণী কাত্যায়নীর প্রদত্ত ১৮ টাকা মাসিকবৃত্তি পাইলেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরীক্ষায়

প্রথম হইয়া ৩০ টাকা বৃত্তি লাভ করিলেন। যে তেজে তাঁহার সম পদস্থ বিচারকগণ তাঁহাকে তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন; সেই তেজের নিকট যে তাঁহার সহধ্যায়ীগণ সকলেই পরাস্ত মানিবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি? ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত কলেজের ছাত্রদিগকে তিনি পরাস্ত করিয়া প্রথম হইলেন ও ৪০ টাকা মাসিক বৃত্তি লাভ করিলেন। এই বৃত্তি তিনি তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাঁহার রচিত ইংরাজি প্রবন্ধ ও পরীক্ষাকালীন অন্যান্য উত্তর সমস্তই শিক্ষা সভা (Council of Education) হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

যেমন বিদ্যায় তিনি সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ছিলেন, সাহসে মহত্ত্বে ও দয়ায়ও তিনি তেমনি ছিলেন। একদিন তাঁহার বাসস্থানের নিকট কোন দরিদ্র ব্যক্তির গৃহে অগ্নি সংযোগ হয়; দ্বারিকানাথ নির্ভয়ে, বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া কলসি কলসি জল স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইয়া সেই দরিদ্রের গৃহ রক্ষা করিয়াছিলেন। এইরূপ কত দিন কত লোকের তিনি কত উপকার করিয়াছিলেন তাহা এখনও হুগলীস্থ কোন কোন বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলে জ্ঞাত হইতে পারা যায়।

সকলের সহিত তাঁহার সমান ভাব ছিল। তিনি অন্যায় কখন সহ্য করিতে পারিতেন না। কত দিন কলেজের শিক্ষকের সহিত তাঁহার "অন্যায়" লইয়া বিবাদ হই

য়াছে। তাঁহাকে তাঁহার সহাধ্যায়ীগণ কর্কশ বলিত; কিন্তু তাহারা সকলেই জানিত যে সেই কর্কশতায় নিম্নে মধুর কোমলতা লুক্কাইত আছে, তাহারা ইহা জানিত বলিয়াই তাঁহাকে অত ভাল বাসিত।

দ্বারিকানাথ কোন ক্রীড়াতেই পশ্চাৎপদ হইতেন না। সমভিব্যাহারীগণ তাঁহাকে যে ক্রীড়ায় আমন্ত্রণ করিতেন, তিনি তাহাতেই সাহ্লাদে অগ্রসর হইতেন। শতরঞ্চ ক্রীড়া তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল, এই ক্রীড়ায় অতি উত্তম ক্রীড়কও তাঁহাকে সহজে পরাস্ত করিতে পারিতেন না।

দ্বারিকানাথ একটু একটু সঙ্গীত বিদ্যারও আলোচনা করিয়াছিলেন; সঙ্গীত একরূপ মন্দ গাইতে পারিতেন না; "তবলা" বাদ্যেও নিতান্ত অপারদর্শী ছিলেন না। সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যাইত যে তিনি পুস্তকের উপর তাঁহার বাদ্য চর্চ্চা করিতেছেন।

এইরূপে সর্ব্ব বিষয়ে দ্বারিকানাথ সকল হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তাঁহার শিক্ষক সাহেবগণ পুনঃ পুনঃ বলিতেন যে কালে দ্বারিকানাথ বাঙ্গালী জাতির মস্তক স্বরূপ হইবেন। তিনি এ পৃথিবীতে অতি অল্প কাল মাত্র জীবনাতিবাহিত করিয়া ছিলেন; সেই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি তাঁহার শিক্ষকদিগের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন; বাঁচিয়া থাকিলে না জানি তিনি আরও কি করিতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বঙ্গদেশকে এক্ষণে আর পূর্ব্বের বঙ্গদেশ বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। দ্বারিকানাথ যখন বিদ্যালয়ে তখনও বঙ্গদেশে খাদ্যাদি সর্ব্ব দ্রব্যই অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হইত। যিনি মাসিক অর্দ্ধ শত মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেন তিনিও সুখে সচ্ছন্দে সমানে পূজাদি ক্রিয়া কর্ম্ম করিয়া এবং অতিথীর পরিচর্য্যা করিয়াও অন্ন গ্রহণ করিতেন। তখন বিজয়া দশমীর দিন গঙ্গাপরে হুগলীর নিকট প্রায় দশ সহস্র প্রতিমা সুসজ্জিত তরণী বক্ষে ভাসিত। হায়! এক্ষণে দারিদ্র রাক্ষসী বঙ্গভূমিকে গ্রাস করিতেছে,—বাঙ্গালী অনাহারেই মরিতে চলিল— এক্ষণে আর বঙ্গে সুখ কোথায়!—সেই দশ সহস্রের প্রতিমার মধ্যে এক্ষণে শত খানাও দৃষ্টিগোচর হয় না; এক্ষণে যাঁহারা "বড়লোক" বলিয়া খ্যাত তাঁহারাও মার পূজা করিতে পারেন না। তখন দ্বারিকানাথের পিতা যদিও যৎসামান্যই উপার্জ্জন করিতেন, তত্রাচ দুর্গতি-নাশিনীর পূজা করিতে অক্ষম ছিলেন না। হুগলীর নিকটস্থ দশ সহস্র প্রতিমার মধ্যে হরমোহন মিত্রেরও এক প্রতিমা ছিল।

একবার পূজার সময় হরমোহন মিত্র মহাশয় কার্য্যে অবসর না পাইয়া হুগলী হইতে বাটী যাইতে পারিলেন না। দ্বারিকানাথ তাঁহার মাতাকে ও ভাই ভগিনীকে

লইয়া নৌকা যোগে বাটী যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে বানে তাঁহাদিগের নৌকা মগ্ন হইল। জাহ্নবী সেই নৌকাস্থ সকলকে নিজ বক্ষে লুকাইলেন—কেবল দ্বারিকানাথ ও তাঁহার ম্যুতা রক্ষা পাইলেন। তাঁহারা ভাসিতে ভাসিতে স্রোত মুখে তরঙ্গে তরঙ্গে যাইতেছিলেন; অন্যান্য নৌকাস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে গঙ্গা বক্ষ হইতে উদ্ধার করিলেন। দ্বারিকানাথ যদি সেই দিন মরিবেন তবে ভারতের উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণের আসন সুশোভিত করিবে কে? তবে কে বাঙ্গালীর সাহস, বীর্য্য, তেজ ও তীক্ষ্ণতা জগতকে দেখাইয়া যাইবে?

এই হৃদয় বিদারক ঘটনার অব্যবাহত পরে তাঁহার পিতা পুত্র কন্যার শোকে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। পিতা যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাই ব্যয় করিতেন সুতরাং পিতার মৃত্যুর পর দ্বারিকানাথ দেখিলেন তিনি নিঃসম্বল এ সংসারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে হইল —কার্য্যের চেষ্টায় কলিকাতায় আসিতে হইল। কিন্তু কার্য্য কোথায়—যেখানে কার্য্যের চেষ্টায় যান, সেই খানেই নৈরাশ ও নৈরাশের সহিত অপমান। যিনি এক দিন দেশের সর্ব্ব প্রধান পদ গ্রহণে সক্ষম হইয়া ছিলেন, তিনিই যৎসামান্য ১০। ১৫ টাকা মাহিয়ানার কার্য্যের জন্য কলিকাতার পথে পথে লালায়িত হইয়া বেড়াইয়া ছিলেন, ইহা ভাবিলে স্বতঃই মনে একরূপ অপূর্ব্ব ভাবের উদ্রেক হয়। নানা স্থানে অপমানিত হইয়া দ্বারিকানাথ পরের দাসত্ব করিবেন না —

প্রতিজ্ঞা করিয়া "আইন" শিক্ষায় মনস্থ করিলেন। সেই দিন কার্য্য সংস্থান করিতে না পারিয়া তিনি হৃদয়ে কত ক্লেশ পাইয়া ছিলেন, কিন্তু সেই দিন কার্য্য না পাওয়াই যে তাঁহার সৌভাগ্যের মূল তাহা কি একবার তাঁহার মনে কখন উদিত হইয়াছিল? আইন শিক্ষার জন্য তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। পাঁচ মাস পরে তিনি কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ পুরাতন ছাত্রদিগের এক বৎসর পাঠ দুই বৎসর বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে অগ্রে পরীক্ষার্থে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। দ্বারিকানাথের কোন অন্যায়ই কখনও সহ্য হইত না, এ অন্যায় সহ্য হইবে কেন? তিনি তৎক্ষণাৎ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বিনা সাহায্যে বিনা উপদেশে তিনি আইন শিক্ষা করিতে লাগিলেন; এই সময়ে তিনি দরিদ্রতার কত ক্লেশ পাইয়া ছিলেন তাহা বর্ণনা অনাবশ্যক। দরিদ্রতার অগ্নিময় পথ অতিক্রম না করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে কে কখন পারিয়াছে? কিন্তু ইহাই যথেষ্ট যে দ্বারিকানাথের দারিদ্র কষ্ট অধিক দিবস ভোগ করিতে হয় নাই; তিনি শীঘ্রই কলিকাতার তৎকালিন জুনিয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের আফিসে ১২৫ টাকা মাহিয়ানার এক কার্য্যে আমন্ত্রিত হইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। দারিদ্র কষ্টে পড়িয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে হইল—পরের দাসত্ব করিবেন না স্থির করিয়া

ছিলেন—কিন্তু দুঃসহ অনাহার ক্লেশ আর সহ্য করিতে পারিলেন না।

হায়! তিনি বাধ্য হইয়া কার্য্য করিতে চলিলেন বটে, কিন্তু চাকরী করিবার নীচবৃত্তি সকল তাঁহার কোথায়? চাকরী করিতে হইলে যাহা যাহা প্রয়োজন, তাহা তাঁহার কই? তিনি কেবল চাকরী পরিত্যাগ করিলেন এরূপ নহে, সংসারের নীচতা ও কপটতা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া সংসার ত্যাগ করিয়া লোকালয়ের গোলযোগ হইতে পলায়ন করিয়া নিজ গ্রামে যাইয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলেন। কিন্তু হায়! ইহাও তাঁহার কার্য্য নহে, এ বৃত্তির জন্যও তিনি জন্ম গ্রহণ করেন নাই। কে তাঁহার কৃষি কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করে?—দ্বারিকানাথ সেক্সপিয়ার, সেলি, মিল, কোমত লইয়া ব্যস্ত। সুতরাং যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহা নহে দেখিয়া অর্থের জন্য তাঁহাকে আবার কলিকাতায় আসিতে হইল; আবার তিনি কায়মনোবাক্যে আইন পাঠে নিযুক্ত হইলেন। এবার ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ত্রয়োবিংশ বর্ষ বয়সে তিনি আইন পরীক্ষায় অতি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন।
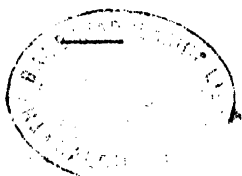
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারিকানাথ "সদর দেওয়ানী আদালতে" আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইলেন। এক্ষণে যাহাকে আমরা "হাই কোর্ট" বলিতেছি, এক্ষণে যাহা আমাদিগের বিখ্যাত ইংরাজিভাষাজ্ঞ ও বক্তাগণ দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে, তাহাই ত্রিশ বৎসর পুর্ব্বে "সদর দেওয়ানী" নামে বিখ্যাত ছিল, তখন অনেক আইনজ্ঞ ইংরাজি একেবারেই জানিতেন না, বাঙ্গালা বা উর্দ্দুভাষায় তাঁহারা বক্তৃতা করিতেন। যে সুরম্য প্রাসাদ তুল্য অট্টালিকায় এক্ষণে বঙ্গের প্রধান বিচারপতিগণ উপবেশন করিতেছেন, দ্বারিকানাথের সময় তাহা নির্ম্মিত হয় নাই; তখন গড়ের মাঠের দক্ষিণে ও ভবানীপুরের উত্তরে সারকিউলর রোডের উপর এক বৃহৎ অট্টালিকায় "সদর দেওয়ানী"র কার্য্য সম্পন্ন হইত। দ্বারিকানাথ "সদর দেওয়ানী"তে প্রবিষ্ট হইলেন—আইন ব্যবসায়ে প্রথম প্রবেশ করিয়াই কাহারও কিছু করিয়া উঠা অতি কঠিন কার্য্য—বিশেষ দ্বারিকানাথ দেখিলেন, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় ও শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহা পরাক্রমে তথায় রাজত্ব করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার পরিশ্রম ও যত্ন, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও তেজের নিকট কে দণ্ডায়মান হইবে? তিনি ত সাধা-

রণের ন্যায় ছিলেন না ; তাঁহার ভিতর একটা কিছু ছিল, যাহা আর কাহারই ভিতর ছিল না, আর কখন কাহারও ভিতরে সেই অমূল্য রত্ন থাকিবে কি না তাহা কেবল জগদাশিপতিই জানেন। কয়েক দিবসের মধ্যেই সকলে বুঝিল যে " সদর দেওয়ানীতে " এক জন প্রবেশ করিয়াছে, সে শীঘ্রই একটা প্রকাণ্ড তেজময় আলোক রাশিতে পরিণত হইবে, সেই আলোক তেজে কেবল ভারত বর্ষ নহে, দূর ব্রিটেনিয়াও স্তম্ভিত হইয়া রহিবে। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি রমাপ্রসাদ দ্বারিকানাথের ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে হস্তান্তর হইতে দেওয়া অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তিনি তাঁহাকে তাঁহার সহকারী (Junior) নিযুক্ত করিলেন। এক দিবস একটী অতি কঠিন মকর্দ্দমায় রামাপ্রসাদ রায় নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু কার্য্য বশতঃ তিনি উপস্থিত থাকিতে না পারায় তাঁহার নূতন সহকারী দ্বারিকানাথ সেই মকর্দ্দমা চালাইতে লাগিলেন। তিনি এরূপ সুন্দর ভাবে ও সুযুক্তির সহিত তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন যে বিচারকগণ তাঁহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। বলা বাহুল্য যে দ্বারিকানাথ মকর্দ্দামায় জয় লাভ করিয়াছিলেন। এই জয়েই তাঁহার চির জয় সিদ্ধ হইল ; ইহার পর তাঁহার আর মকর্দ্দমার জন্য চেষ্টা করিতে হইল না। রাশি রাশি মকর্দ্দমা ও শত শত লোকে তাঁহার সাহায্য পাইবার জন্য ব্যাকুল হইল। এত শীঘ্র এত দূর বিখ্যাত হইতে ও এত অর্থ আইন ব্যবসায়ে উপার্জ্জন করিতে এ পর্য্যন্ত কেহই সমর্থ হন নাই। তাঁহার ন্যায় ইংরাজি

ভাষাজ্ঞ, তাঁহার ন্যায় অঙ্ক ও দর্শন শাস্ত্রে পণ্ডিত, তাঁহার ন্যায় আইনজ্ঞ তখন (আর এখনই বা কয় জন আছেন ?) আর কেহই ছিলেন না। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে ব্যক্তি অর্থের জন্য লালায়িত হইত, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে ব্যক্তি একটী সামান্য চাকরীর চেষ্টায় বহির্গত হইয়া পদে পদে অপমানিত হইয়া ছিল আজ সে সদর দেওয়ানীর একজন প্রধান উকিল, আজ সে ধনে মানে বিদ্যায় সর্ব্বত্র পূজিত। সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্ব বিষয়ে আজ সে অগ্রগণ্য।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানীকে বিদায় দিয়া হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইল। বিখ্যাত পণ্ডিত ও আইনজ্ঞ, ভারতের শুভানুধ্যায়ী সার্ বারনেস্ পিকক্ ইহার প্রধান বিচারপতি হইলেন। একজন বঙ্গবাসীকেও এই বিচারালয়ের উচ্চাসনে উপবেশন করাইয়া সম্মানিত করিতে গভর্মেণ্ট মনস্থ করিলেন। রমাপ্রসাদ রায় ভিন্ন আর কে এই সম্মান প্রাপ্তির উপযুক্ত? কিন্তু হায়, যখন মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়া তিনি সজল নয়নে পুত্র কন্যাগণকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি শুনিলেন যে তিনি ভারত বর্ষের উচ্চতম বিচারালয়ের বিচারাসনে নিযুক্ত হইয়াছেন— কিন্তু তিনি উচ্চতম হইতেও উচ্চতর বিচারালয়ে আহ্বানিত হইয়াছেন,—পার্থিব বিচারালয়ের আজ্ঞা রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে একণে অসাধ্য। সুতরাং রমাপ্রসাদের সমকক্ষ বা এক পদ নিম্নবর্ত্তী পণ্ডিত শম্ভুনাথই নূতন হাইকোর্টের নূতন আসনে উপবিষ্ট হইলেন। এই রূপে আইন ব্যবসায়ীর মধ্য হইতে উচ্চতম ব্যক্তিদ্বয় অপসারিত হইলেন, তখন আর

দ্বারিকানাথের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়, এইরূপ আইনজ্ঞ কেহই রহিল না। তিনি সর্ব্ববাদি সম্মত প্রধান উকিল বলিয়া পরিচিত ও পরিগণিত হইলেন। তাঁহার ন্যায় উপার্জ্জনও আর কাহারও রহিল না। এই রূপে সাত বৎসরের মধ্যেই তিনি হাইকোর্টে আপন অধিকার সম্পূর্ণ বিস্তৃত করিতে পারিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য মাত্র যে দ্বারিকানাথ ন্যায় ভিন্ন অন্যায় মকর্দ্দমা কখনই গ্রহণ করিতেন না। যে ব্যক্তি সামান্য অন্যায় সহ্য করিতে না পারিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন শিক্ষায় জলাঞ্জলী দিয়াছিলেন, তিনি যে কখন অন্যায়ের সমর্থন করিতেন ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

যে মকর্দ্দমার জন্য—যে দরিদ্রপক্ষ সমর্থনের জন্য দ্বারিকানাথের নাম সর্ব্বদা পূজিত হইবে, সেই বৃহৎ মকর্দ্দমা হাইকোর্টের ফুলবেঞ্চে ১৫ জন বিচারপতি কর্ত্তৃক ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রুত ও মিমাংশিত হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ আইন বশতঃ প্রজা ও জমিদারে ক্রমাগতই বিবাদ হইতে লাগিল—জমিদারেরা প্রজা দিগের কর বৃদ্ধি করিলেন ও অনাদায়ের জন্য তাহাদিগের নামে অভিযোগ করিয়া কর আদায় করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই বিবাদ মিমাংসার জন্য হাইকোর্টে অভিযোগ হইল; জমিদারদিগের পক্ষ সমর্থন জন্য বিখ্যাত কৌন্সিলীদ্বয় ডইন ও উডরফ্ নিযুক্ত হইলেন, যাট লক্ষ প্রজার পক্ষে সাহসে ও নির্ভয়ে দ্বারিকানাথ মিত্র দণ্ডায়মান হইলেন। সাত দিবস ধরিয়া ১০ টা হইতে ৫ টা পর্য্যন্ত দ্বারিকানাথ প্রজার কাহিনী স্বতেজে

বলিলেন। না জানি সে কত শোভা হইয়াছিল, যখন উচ্চে ১৫ জন বিচারপতী গম্ভীর ভাবে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, চতুর্দ্দিকে অসংখ্য লোক নীরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, আর সেই স্থানে দ্বারিকানাথ গম্ভীর স্বরে নির্ব্বোধ মূর্খ বাক্‌শক্তি বিহীন অর্দ্ধাহারী দরিদ্র প্রজাদিগের হইয়া স্বতেজে বক্তৃতা করিতেন। অবশেষে যখন বলিলেন, "মহামাননীয়গণ, আর আমার কিছু বলিবার নাই দরিদ্র সহস্র সহস্র প্রজার এক মুষ্টি প্রত্যাহিক অন্ন, আপনাদের বিচারের উপরনির্ভর করিতেছে। এই আমার শেষ বক্তব্য— আর আমার কিছু বলিবার নাই।" তখন বিচারপতিগণ সকলেই বিশেষ মুগ্ধ ও বিচলিত হইয়া ছিলেন। দ্বারিকানাথ জয়ী হইলেন, কিন্তু তাহারা কয়জন বুঝিল যাহা দিগের জন্য তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করিলেন, তাহারা কয়জন বুঝিল বা জানিল যে দ্বারিকানাথ তাহাদের জন্য কি করিলেন। তিনি কাহাকেও বুঝাইবার জন্য কখন কিছু করিতেন না, ন্যায়ের মান্য রক্ষা করাই তাঁহার কার্য্য; প্রাণপণে তাহাই তিনি সর্ব্বদা করিয়াছেন। কত দরিদ্রের পক্ষ তিনি বিনা অর্থ গ্রহণে সমর্থন করিয়াছেন তাহা ব্যক্ত করিতে গেলে এক বৃহৎ পুস্তক হইবে।

দ্বারিকানাথ সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করিলেন। মহা আড়ম্বরে ও সুখে কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এক প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নিজ পৈতৃক ভূমি আগুনসীতে নির্ম্মাণ করিলেন। তথায় প্রতি বৎসর মহামায়ার পূজাকালে যাইতেন; মহা সমারোহে প্রতি বৎসর

এই পূজা সম্পন্ন করিতেন। কি বিচারালয়ে, কি বাটীতে দ্বারিকানাথ সকলেরই প্রিয়,—তাঁহার সহিত কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য কথোপকথন করিতে পাইলে কত লোকে আপনাদিগের জীবন সফল জ্ঞান করিত। তাঁহার গুণবতী ভার্য্যা একটী পুত্র ও কন্যা জগতে আনয়ন করিয়া তাঁহার গৃহ আলোকিত, তাঁহাদিগের জীবন সুখময় করিলেন। যেমন এক সময় তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন তেমনি এক্ষণে তিনি সুখ ভোগ করিতে থাকিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন জষ্টিস্ শম্ভুনাথ পণ্ডিত কয়েক মাস মাত্র বিচারাসনে বসিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তখন কে তাঁহার পদে উন্নীত হইবেন, এই বিষয় লইয়া উকিলগণের মধ্যে আন্দোলন হইতে লাগিল। সদর দেওয়ানীর পুরাতন উকিলগণের মধ্যে বঙ্গের উচ্চতম বিচারাসনে উপবেশন করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি আর কেহই ছিলেন না,—সুতরাং নূতন হাইকোর্টের নূতন আইনজ্ঞ দিগের উপরই সকলের দৃষ্টি পড়িল। নব্য দিগের মধ্যে দ্বারিকানাথ তাঁহাদিগের মস্তক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন; এক রূপ সকলেই বুঝিলেন যে দ্বারিকানাথই এই পদ প্রাপ্ত হইবেন।

জুলাই মাসের এক দিবস দ্বারিকানাথ কোর্টে আসিয়া বঙ্গের তখনকার লেফটেনাণ্ট গর্ভরণর সার উইলিয়ম গ্রের নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন। তিনি দ্বারিকানাথকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। দ্বারিকানাথ অবিলম্বে শকটারোহণে "বেল-ভেডিয়ারে" যাত্রা করিলেন। দেখিতে দেখিতে এই কথা হাইকোর্টের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল;—সকলই ব্যাকুল হৃদয়ে দ্বারিকানাথের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দ্বারিকানাথ গ্রে সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি তাঁহাকে কহিলেন যে, চিফজষ্টিস্ সার্ বারনেস্ পিকক্ তাঁহাকে

শম্ভুনাথের পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। গভর্ণর জেনেরেল মহারাণীর অনুজ্ঞা প্রার্থনার পূর্ব্বে তাঁহার এ পদ গ্রহণে মত আছে কি না ইহা জানিবার জন্য তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন। দ্বারিকানাথ এরূপ অযাচিত সম্মান গ্রহণে অসম্মতি প্রদান করিতে পারিলেন না। তাঁহার আয় এই উচ্চপদ গ্রহণে অনেক হ্রাস হইল সত্য—তত্রাচ তিনি ইহা গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। তিনি হাইকোর্টে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন,—তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার জজ পদে নিযুক্ত সংবাদ সর্ব্বত্রে প্রচারিত হইয়া পড়িল।

এইরূপে কেবল মাত্র চতুস্ত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রমে তাঁহার পিতৃ তুল্য বয়স্ক জজদিগের সহিত তিনি একাসনে উপবেশন করিলেন। এত অল্প বয়সে কেহ কোন দেশে এরূপ উন্নত পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না সন্দেহ। ইংরাজ রাজ্যে যে রাজকার্য্য হইতে উচ্চতর কার্য্য বাঙ্গালীর প্রত্যাশায় ছিল না সেই কার্য্য কত শত লোককে পশ্চাৎ করিয়া দ্বারিকানাথ বিনা আয়াসে ও বিনা প্রার্থনায় প্রাপ্ত হইলেন। যাঁহারা এরূপ হয়েন তাঁহারা এইরূপ হইবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। সহস্র সহস্র বাধা বিপত্তি পড়িলেও তাঁহাদের গতি কেহ রোধ করিতে পারে না। দ্বারিকানাথ বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধিকরণে উপবেশন করিয়া কিরূপে ন্যায় বিতরণ করিতেন তাহা বলিবার আবশ্যক নাই। তাঁহাকে—তাঁহার সমপদস্থগণ কিরূপে সম্মান করিতেন তাহার উল্লেখ

করিবারও প্রয়োজন নাই; এখনও যেন তাঁহার সেই জলদ গম্ভীর বিচার বাক্য বঙ্গের আকাশে গভীর ভাবে প্রতি-ধ্বনিত হইতেছে। কি বিচারালয়ে, কি গৃহে, কি ধনীর নিকট, কি দরিদ্রের নিকট, কি রাজার নিকট, কি প্রজার নিকট, কি দেশে, কি বিদেশে সর্ব্বত্রে তিনি সমাদরিত হইতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত প্রধান প্রধান সভার সভ্য মনোনীত হইলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সভার সভ্য হইলেন, বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের জনৈক তত্ত্বাব-ধারক হইলেন; দেশের কোন কার্য্যেই দ্বারিকানাথ আর অনুপস্থিত নহেন। দেশকে প্রাণের সহিত তিনি ভাল বাসিতেন, দেশের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাঁহার জন্ম হইয়া-ছিল, অভাগিনী বঙ্গভূমিকে জগতে উন্নীত করিবার জন্যই তাঁহার মৃত্যু জাহ্নবী সলিলে হইয়াও হয় নাই। তিনি দেশকে ভাল না বাসিলে আর কে ভাল বাসিবে?

এই সময়ে লর্ড মেও ভারত শাসন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন; দ্বারিকানাথকে তিনি বড় সম্মান করিতেন, প্রায় সমস্ত বিষয়ে দ্বারিকানাথের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি-তেন। কত দিন তিনি দ্বারিকানাথকে নিমন্ত্রণ করিয়া-ছেন ও স্বস্ত্রীক তাঁহার সহিত উপবেশন করিয়া আহা-রাদি করিয়াছেন। তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল যে তিনি তাঁহাকে তাঁহার কার্য্যকারক সভার জনৈক সভ্য নিযুক্ত করেন। কিন্তু হায়! দূর সাগর মধ্যস্থ দ্বীপোপরে নিষ্ঠুর ভাবে দুরাত্মারা তাঁহার প্রাণ সংহার করিল; তিনি বাঁচিয়া থাকিলে হয় তো ভারত শাসন কার্য্যে

একজন বাঙ্গালীকে আমরা দেখিয়া আমাদিগের জীবন চরিতার্থ করিতে পারিতাম। তাঁহার অকাল ও হৃদয় বিদারক মৃত্যুর পর লর্ড নর্থব্রুক ভারত শাসনে আগমন করিলেন; ইহাঁর সহিতও দ্বারিকানাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। এই সময়ে গভর্ণর জেনেরলের কার্য্যকারক সভার সার আরথার হব হাউস আইন সম্বন্ধীয় সভ্য ছিলেন। ইহাঁর সহিত দ্বারিকানাথের বিশেষ সৌহার্দ্দ হইয়াছিল—বোধ হয় এরূপ বন্ধুত্ব কখন কোন বাঙ্গালীতে ও ইংরাজে হয় নাই। কেন না হইবে?—দ্বারিকানাথ তাঁহার সম সাময়িক স্বদেশবাসীগণ অপেক্ষা অনেক পরবর্ত্তী কালের লোক ছিলেন। সহস্র বৎসর পরেও বাঙ্গালী জাতি দ্বারিকানাথ যে উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বাঙ্গালীকে উচ্চ শিক্ষা শিখাইয়া গিয়াছেন সে স্থানে উপস্থিত হইতে পারিবে না। ইহাঁরা জগতে আলো বিতরণ করিতে আইসেন; শত শত বৎসর পরে ইহাঁদের ন্যায় অমূল্য রত্নের জন্ম হয়;—ইহাঁদের ন্যায় হয় এমন সাধ্য কাহার? ইহাঁরা পথ দেখাইয়া দিতে আইসেন—পথ দেখাইয়া চলিয়া যান; আমাদিগের কার্য্য ইহাঁদের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হওয়া।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দ্বারিকানাথ জজ পদে উন্নীত হইয়া অসংখ্য কার্য্য ভারে দিন রাত্রি নিযুক্ত থাকিতে লাগিলেন।—কিন্তু এত কার্য্যের মধ্যেও তাঁহার প্রিয়বন্ধু পুস্তককে ভুলিলেন না। ফরাসী ও লাটীন ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিলেন,—শেষে ফরাসী ভাষার পুস্তকই তিনি অধিক পাঠ করিতেন। ফরাসী দেশে সে দিন যে মহা পণ্ডিত নূতন ধর্ম্ম ও নূতন বিজ্ঞান জগতে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, দ্বারিকানাথ সেই মানবকুলের অগ্নি স্বরূপ আগষ্ট কোমতের পুস্তক সকল পাঠ করিতেন। পাঠ করিবামাত্র তাঁহার মনে এক অভিনব ভাবের উদয় হইল—তিনি কোমতের পুস্তকে মোহিত হইয়া গেলেন; কোমতের ধর্ম্ম * অবলম্বন করিলেন; কোমতের ইংলণ্ডস্থ প্রধান শিষ্য ডাক্তার কনগ্রেভের সহিত পত্রাদি লিখিতে লাগিলেন। এই ধর্ম্ম ভারতে প্রচার করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

---

* কোমতের ধর্ম্ম কি এক কথায় বুঝান দুঃসাধ্য। তবে এই মাত্র বলি যে কোমত ঈশ্বর ঠিক মানিতেন না, তিনি মানবজাতিকে পূজা করিতে বলেন। সকলেরই ইংরাজিতে এই বিখ্যাত চিন্তাশীলের পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য।

কেবল কোমত নহে,—অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তক তিনি কত পাঠ করিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা নাই। ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় এমন কোন আবশ্যকীয় পুস্তক ছিল না, যাহা তিনি পাঠ করেন নাই। সংস্কৃতেও অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছিলেন,—তিনি সময় পাইলেই পাঠ করিতেন; অনেকক্ষণ ধরিয়া জলে পড়িয়া থাকিতে তিনি বড় ভাল বাসিতেন,—স্নানের এই সময়ও তিনি অনর্থক কাটাইতেন না; এই সময়ে তিনি বটতলার মুদ্রিত বঙ্গভাষার প্রাচীন কবিদিগের কাব্য পাঠ করিতেন।

এইরূপে সম্মানে, ধনে, বিদ্যায়, সর্ব্ব বিষয়ে দ্বারিকানাথ সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া সুখে সচ্ছন্দে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা হইয়াছিল। কন্যার বিবাহ বহুবাজারস্থ শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত দেন। জামাতা ও পুত্র উভয়েই তাঁহার নিজ তত্ত্বাবধারণে রিজ সাহেবের শিক্ষাধীনে শিক্ষালাভ করিতেছিলেন। দ্বারিকানাথের পূর্ব্ব স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি মাতার বিশেষ অনুরোধে এই সময়ে পুনর্ব্বার বিবাহ করেন। কিন্তু হায়! এই অনাথিনীকে তিনি দুঃখসাগরে ভাসাইয়া শীঘ্রই চলিয়া গেলেন!—

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি অযোধ্যা প্রদেশে ভ্রমণার্থে গিয়াছিলেন, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পীড়িত হইলেন; ক্রমেই পীড়ার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি শয্যাশায়ী হইলেন। ভারত

বর্ষের শাসনকর্ত্তা হইতে সামান্য ভিক্ষুক—যে এক দিবস তাঁহার দয়ায় জীবন রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল—সকলই তাঁহার পীড়ার কথা শুনিয়া ব্যথিত হইলেন। কত কত লোক তাঁহার শারীরিক অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য ব্যাকুল হইল; কত কত লোক তাঁহার দ্বারে প্রত্যহ সমাকীর্ণ হইতে লাগিল। তিনিও বুঝিলেন যে তাঁহার এ পৃথিবীর দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। তিনি তাহাই তাঁহার জন্মভূমি আগুন্সীতে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন;—কাহারও কথা শুনিলেন না; সেই আসন্ন অবস্থায় তিনি নৌকারোহণে আগুন্সীতে উপস্থিত হইলেন। দ্বারিকা-নাথের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া গ্রামস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে যাইয়া পথে দাঁড়াইল। সেই লোক সমি-তির মধ্য দিয়া দ্বারিকানাথ চলিলেন,—তাঁহাকে যে তাঁহার গ্রামের সকলেই ভাল বাসেন ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার সেই মৃত্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত শুষ্ক বদনেও আনন্দের রেখা দেখা দিল। তিনি আগুন্সাতে আসিয়া যেন সমস্ত ব্যাধি যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। সকলেই তাঁহার এই ভাব দেখিয়া আনন্দিত হইল, কিন্তু কে জানিত যে নির্ব্বাণোন্মুক প্রদীপের শেষ প্রজ্বলনের ন্যায় তাঁহারও এই ব্যাধির সুস্থতা হইবে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে ফেব্রুয়ারি বৈকাল চার ঘটিকার সময় আগুন্সীর মোক্তারের পুত্র, ভারতের গৌরব, দ্বারিকানাথ মিত্র ধীরে ধীরে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া স্বর্গীয় রাজ্যে প্রয়াণ করি-লেন। আর সে অনাথিনী বিধবা ও অনাথ পুত্র পরি-

বারের ক্রন্দন বর্ণনার প্রয়োজন কি? আর সে বঙ্গদেশের ও ভারতবর্ষের খেদের উল্লেখ আবশ্যক কি? আর সে সব কথার প্রয়োজন কি।

যে সুন্দর আলোকময় পদ উন্মুক্ত করিয়া দ্বারিকানাথ চলিয়া গিয়াছেন। হে বিধাতঃ! আমাদিগকে সেই পথে বিচরণ করিতে বল দেও; যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা তাঁহার জলন্ত অগ্নিময় জীবনে দেখিয়াছি, হে পিতঃ! আমাদিগকে সেই দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিবার ক্ষমতা দেও।*

---

* বাবু দীনবন্ধু সান্যাল কর্তৃক প্রণীত দ্বারিকানাথ মিত্রের জীবনী ইংরাজি ভাষায় অতি সুন্দর হইয়াছে। ইহার মূল্য ৩॥০ টাকা মাত্র, অসমর্থ পক্ষে ২। এই প্রবন্ধে উক্ত পুস্তক হইতে অনেক সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

কেশবচন্দ্র সেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুর ঠিক তিন বৎসর পরে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ নভেম্বর কলিকাতাস্থ কলুটোলা নামক স্থানে কেশবচন্দ্র সেন জন্ম গ্রহণ করিলেন। যাঁহার গৃহ তাঁহার জন্মে আলোকিত ও পবিত্র হইল তিনি ধনে ও বিদ্যায় সর্ব্বত্র সম্মানিত হইতেন। কেশবের পিতামহ খ্যাতনামা রামকোমল সেন। পিতা পেয়ারীমোহন কলিকাতার বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান ছিলেন। কেশব পিতার মধ্যম পুত্র।

যে বৃক্ষ পরে শাখা প্রশাখা বিস্তৃত করিয়া শত শত পথিককে আশ্রয় দান করিবে তাহার ক্ষুদ্র অঙ্কুর দেখিলেই তাহার ভবিষ্যত উপলব্ধি করিতে পারা যায়। মাতার পদপ্রান্তে ক্রীড়াশীল শিশু কেশবকে দেখিয়াই অনেকে বুঝিয়া ছিলেন যে এ শিশু সামান্য নহে। বালক কেশব যোগীর ন্যায় বেশ পরিধান করিয়া চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া বেড়াইতে ভাল বাসিতেন, আবার ইংরাজের ন্যায় বেশ পরিধান করিয়া নিজ বাটীস্থ স্ত্রীলোকদিগকে কতই নূতন নূতন "ম্যাজিক" কৌতুক দেখাইতেন।

যে স্থানে এক্ষণে এলবার্ট হল শোভা পাইতেছে সেই স্থানে চাল্লশ বৎসর পূর্ব্বে সামান্য একটী ভগ্ন

অট্টালিকা বিদ্যমান ছিল, ঐ অট্টালিকার দালানে প্রত্যহ প্রাতে এক গুরুমহাশয় এক দল বালক লইয়া মহা কোলাহল করিতেন—ঐ বালকদিগের মধ্যে একটী সুন্দর বালকের সুমিষ্ট স্বর সমস্ত গোলযোগকে অতিক্রম করিয়া উত্থিত হইত। এ বালক আর কেহই নহে, পরে যাহার স্বরে সমস্ত পৃথিবী প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া থাকিত, এ সেই কেশবচন্দ্র সেন। পাঠশালা ত্যাগ করিয়া কেশব হিন্দুকলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। যে কয়েক বৎসর এই স্থানে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে কেহ পাঠে অমনোযোগী হইতে দেখে নাই।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে দশ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রমে তিনি তাঁহার পিতাকে হারাইলেন। এই দুর্ঘটনার জন্যই হউক, বা অন্য যে কারণেই হউক কেশব হিন্দুকলেজ পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুমেট্রপলিটন কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। এই বিদ্যালয়ে খ্যাতনামা কাপ্তেন রিচার্ডসন শিক্ষা দান করিতেন ও তিনিই ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন। রিচার্ডসনের নিকট যাঁহারা যাঁহারা শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন সকলেই পরে বিদ্বান বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, কিন্তু হায়! রিচার্ডসন কেশবের কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কেশব শীঘ্রই তাঁহার বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া প্রেসিডেন্সিতে প্রবিষ্ট হইলেন। অঙ্ক শাস্ত্রই তাঁহার পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার পক্ষে পরম শত্রু হইয়া দাঁড়াইল, তিনি সাহিত্য, দর্শন ও কাব্যে এত নিমগ্ন হইয়াছিলেন যে, অঙ্কশাস্ত্র পাঠে অনর্থক সময় নষ্ট মনে করিতেন। সুতরাং

বিদ্যালয়ে তাঁহার সময় নষ্ট হয় মনে করিয়া কেশব সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিদ্যালয় হইতে বিদায় লইলেন। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া তিনি নিজেই এক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন। দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে এই বিদ্যালয়ে প্রত্যহ রাত্রিকালে তিনি নিজে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। তাঁহার কার্য্য দেখিয়া তাঁহার আত্মীয়গণ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন, কিন্তু কে তাঁহাদিগের কথা শুনে? কেশব তাঁহার দল বল লইয়া সেই সময়ে "হ্যামলেট" অভিনয় করিতে ছিলেন। "হ্যামলেট" অভিনয় হইলে তিনি কোন বাঙ্গালা পুস্তক অভিনয় করিতে মনস্থ করিলেন। সে সময়ে বঙ্গদেশে কৃষ্ণযাত্রা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। অভিনয় কাহাকে বলে তাহাই অধিকাংশ লোক জানিতেন না। কেশব মহা সমারোহে হিন্দুমেট্রোপলিটন কলেজ বাটীতে বিধবা বিবাহ নাটক অভিনয় করিলেন।

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহার বিবাহ দেওয়াই স্থির করিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ২১ এপ্রেল মহা সমারোহে বালী গ্রাম নিবাসী চন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয়ের কন্যা গোলাপ সুন্দরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। যৎকালে বর কন্যা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ছিলেন সেই সময়ে একটী মহা দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়। যে নৌকায় কন্যা আসিতে ছিলেন তাহা ঝটিকা মুখে পতিত হওয়ায় মগ্ন হইল কিন্তু তিনি যদি সে দিন মরিবেন, তাহা হইলে পরমেশের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে কিরূপে?

তাহা হইলে একটী সুবিস্তৃত রাজ্য বাঙ্গালীর সন্তানে আসিয়া বর্ত্তিবে কিরূপে?

এইরূপ নানা কার্য্যের মধ্যেও কেশব পাঠ ত্যাগ করেন নাই। এই সময়ে তিনি অতি মনোযোগের সহিত টমাস বোর্ণ নামক জনৈক খ্রীষ্টান মিসনরি সাহেবের নিকট বাইবল্ পাঠ করিতেছিলেন; এতদ্ব্যতীত ইংরাজি ভাষার প্রায় অধিকাংশ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পুস্তকও শেষ করিয়াছিলেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাগ্মীপ্রবর জর্জ টমসন সাহেব তাঁহার কলুটোলা "ইভনিংস্কুলে" পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে, আগমন করিয়া অতি সুন্দর এক বক্তৃতা করেন; কেশব সেই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যেমন করিয়া পারি একজন বক্তা হইব। সেই দিবস হইতে কত দিন কত জন দেখিয়াছে যে তিনি নিজ শয়ন গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া চিৎকার করিতেছেন, গভীর রাত্রিতে বাটীর ছাদোপরি যাইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন। ইহাতেও বক্তৃতা ক্ষমতা লাভের সম্পূর্ণ সুবিধা হয় না বুঝিয়া তিনি বন্ধু বান্ধবগণকে লইয়া "গুড উইল ফ্রেটরনিটী" নামক এক সভা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সভার অধিবেশন তাঁহাদিগের বাটীতেই হইত, কেশব সর্ব্বদাই ইহাতে ইংরাজিতে বক্তৃতা করিতেন। ইহাতেও তাঁহার সন্তোষ হইল না; ড্যাল সাহেব, হালুয়ার সাহেব, উড্রো সাহেব ইত্যাদি অনেককে লইয়া তিনি "ব্রিটিস ইণ্ডিয়া সোসাইটী" নামক এক বৃহত্তর সভার সৃষ্টি করিলেন। এখনও বৃদ্ধ ড্যাল সাহেব সজল

নয়নে বলিয়া থাকেন কিরূপ তেজের সহিত ঈশ্বরের অপা মহিমা বর্ণনা করিয়া কেশব একদিন "ব্রিটিস ইণ্ডিয় সোসাইটীর" অধিবেশনে প্রস্তাব করেন যে এই সভার সভ মাত্রেরই উপাসনা করা একটী কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে হউক। যে ঈশ্বর প্রেম তিনি দুই হস্তে মানবকে বিলাইয়া গিয়াছেন, বালক কেশবের হৃদয়ে তাহার অভাব ছিল না। যে প্রে ধর্ম্মের নিশান তিনি জগতে উড্ডীয়মান করিয়া গিয়াছে তাহার বীজ অপরিষ্ফুট ভাবে তখনও তাঁহার হৃদয়ে লুক্কা ইত ছিল। সাধে কি কলিকাতা সুদ্ধ নর নারী তাঁহার মৃত্যু বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রন্দন করিয়াছিল?